নবম বর্ষ—নবম সংখ্যা

পৌষ ১৩৭৬/জানুয়ারি ১৯৭০

পৌষপার্বণ

সুলতা সেনগুপ্ত

পৌষপার্বণ আজ পৌষপার্বণ !
হাসিখুশি মুখে এসো ভাই আর বোন।
ছেড়ে এলে লেখা-পড়া আজ নেই দোষ।
বন্ধু আনবে ডেকে দুই চারজন,
পৌষপার্বণ !
যখন তখন আজ পায় যদি খিদে
রয়েছে আসকে-পিঠে নেই অসুবিধে
অম্বেশে পায়েশ নাও, খাও রসবড়া
শুনবেন মাসি পিসি, পেট আছে ভরা।

পাটিসাপটাকে খাও ক্ষীর মেখে মেখে
সরুচাকলিটা দেখো কপি দিয়ে চেখে
মালপো, গোকুল পিঠে যেয়ো নাকো ফেলে—
কিচ্ছু শেখেনা খেতে একালের ছেলে !

চুষিটুকু চুষে খাও, উঠোনা উঠোনা—
রোদে বসে পুলিপিঠে করো চর্বণ
সুবোধেরা অনুরোধ রাখবে সবার
দিদিমার ঠাকুমার পৌষপার্বণ !

(পনের জন ভারতীয় স্কুলের ছেলেমেয়ে, প্রেসিডেণ্ট ব্রোকেনসিলের নিমন্ত্রণে, টণ্টামোরা রাজ্যের স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দেবার জন্য প্লেনে করে আসছিল রাজধানী টাণ্টামোরায়।

ব্রাণ্টালুসি পর্বত ও ঘন জঙ্গলময় উপত্যকার উপর দিয়ে যাবার সময়ে প্লেনটি প্রবল ঝড়ের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যায়।

সাময়িকভাবে সমস্ত আনন্দ উৎসব স্থগিত রাখা হল। পাহাড়ের কোলে তির্নিকা গ্রাম থেকে, হেডমাস্টার আরডনের নির্দেশে মিডি, কিকু ও হকোর নেতৃত্বে তিনটি উদ্ধারকারী দল তিনদিক দিয়ে অনুসন্ধান সুরু করল।

কিন্তু মাজিনকোর গভীর জঙ্গল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তার উপরে আবার সেখানে শয়তান গ্রাটেনকোর উৎপাত।

ওদিকে স্কুলদলের দলপতি রাণা মজুমদার অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞান হয়ে কার যেন যন্ত্রণাকাতর গলার আওয়াজ শুনতে পেল। তার নিজের সিটের বেল্টটা চেপে বসেছে কোমরে। তবে আর কোন কষ্ট নেই।)

(২)

ও ভয় পেয়েছে। এ ভয় ওকে জয় করতে হবে, ও না দলপতি এই দলের। হঠাৎ মনে হল ওর এমন করে ও এখন কেন সময় নষ্ট করছে। ওকে তো এখুনি উঠে দেখতে হবে কার কতটুকু কি চোট লেগেছে। ও না স্কাউট ক্যাম্পে ফার্স্ট এইড শিখেছে। না না নিজের ব্যথা কষ্ট এসবের কথা ভাবা তো দলপতির কাজ নয়। ওকে তো, ভাবতেই হবে সমস্ত দলের কথা। সমস্ত দলের ভাল মন্দই তো দলপতির ভাল মন্দ।

…উঃ উঃ আঃ!

কে অমন করে কাতরাচ্ছে! নিশ্চয়ই তার আঘাত লেগেছে খুব। তবু কেন এমন করে শুয়ে রয়েছে দলপতি রাণা মজুমদার! সমস্ত শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে নিজের হাত দুটোকে নাড়াল রাণা। —এইতো পেরেছে। ব্যাস।—কোমরের বাঁধনটা খুলে ফেলে পিছলে ভাঙ্গা সিটটা বেয়ে নিচে নেমে দাঁড়াল ও।—ধন্যবাদ ভগবান!

আমার কিছুই হয়নি! কিছুই না। তোমাকে শতকোটি ধন্যবাদ দেব যদি তুমি অন্য সবাইকেও, আমার মতন বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দাও!

উঃ উঃ।

বড় বড় চোখ করে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সামনের দিকে তাকাল রাণা। অন্ধকার চোখে সয়ে আসতেই দেখল—সমস্ত প্লেনের ভিতরটা যেন তাল গোল পাকিয়ে গেছে। ভাঙ্গা সিট, ছেঁড়া তার আর তোবড়ান এলুনিয়াম পাতের জটের মধ্যে ওর বন্ধু বান্ধবরা যেন কেমন জড়িয়ে গেছে। এমন ভীষণ অবস্থায় একা ও কি করবে! ভয় পেয়ে ও যেই একটু পিছতে যাবে কে যেন পিছন থেকে বলল—সাবধান। যেখানে আছ সেইখানেই থাক।—আনন্দে বুকের ভিতরটা নেচে উঠল রাণার এতে। গ্রাহামের গলা। বিলি গ্রাহাম তাহলে ভালই আছে।

—ক্যাপ্টেন, আশা করি তোমার কোন চোট লাগেনি। জিজ্ঞাসা করল বিলি গ্রাহাম।

—না লাগেনি। তোমার? পাল্টা জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—না আমারও কিছুই হয়নি। তবে আমি আমার কোমরের বেল্টটা কিছুতেই খুলতে পারছি না —বলল বিলি গ্রাহাম—সাবধানে এগিয়ে এসে দেখতো আমাকে ছাড়াতে পার কিনা।—

—দাঁড়াও দেখছি।

কাঁপা হাত দুটোকে অনেক কষ্টে নিজের বসে এনে বিলির কোমরের বেল্ট খুলতে চেষ্টা করল রাণা।

—'বিলি' —বলল, রাণা— 'আমাদের প্রথম কাজই হবে সবাইকে খুঁজে বার করা আর উদ্ধার করা।

—নিশ্চয়ই। বলল বিলি।—আমাকে আগে আমার পায়ের উপরে দাঁড়াতে দাও ক্যাপ্টেন।

প্রাণপণ চেষ্টা করে বিলিকে বেল্টের বাঁধন থেকে মুক্তি দিল রাণা।

মাটিতে দাঁড়িয়েই বিলি বলল—ক্যাপ্টেন প্রথমেই চল দেখি কে অমন করে কাতরাচ্ছে।

—হ্যাঁ তাই চল বলল রাণা।

ওরা সামনের দোমড়ান মোচড়ান সিট আর ধাতু পাতগুলোকে পার হয়ে এগোতে যাবে যেই— অন্ধকারের মধ্যে থেকে আবার কে যেন বলে উঠল— ও কি করছ। এগিও না দাঁড়াও। দাঁড়াও

—টম কার্পেন্টার। উৎসাহে বলল বিলি। —কোথায় তুমি টম?

—ঠিক তোমাদের সামনের ভাঙ্গা সিটগুলোর নিচে।

—তোমাকে চোট লাগেনিতো। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—না ক্যাপ্টেন। তবে আমার সাথে আছে গুরুদিৎ। ও কিন্তু অজ্ঞান। বুঝতে পারছি না ওর কিছু হয়েছে কিনা।

—এসো ক্যাপ্টেন আমরা সিটগুলো সরাই। ব্যস্ত হয়ে বিলি বলল

ধাতুটুকরোর নিচ থেকে টম বলল—হ্যাঁ তাই কর কিন্তু একজনে। অন্যজন যাও দেখ কে অমন করে কাতরাচ্ছে। আমাদের চাইতে তার দরকার হয়ত অনেক বেশী।

—ঠিক বলেছ। রাণা বলল। তুমি থাক বিলি, আমি এগোচ্ছি।

ভাঙ্গা সিট আর দোমড়ান মোচড়ান ধাতুর পাতগুলো কোন মতে পার হয়ে এলো রাণা। অন্ধকার চোখে সয়ে গেলেও তেমন স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়াও ভয় হল ওর যদি না বুঝে ওর বন্ধুদের কারও উপরেই গিয়ে পড়ে শেষে। দুহাতে দুচোখ কচলে ও অন্ধকারটাকে আরও সয়ে নিতে চেষ্টা করল তারপর চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় বলল— কে আছে এখানে। —কে?

—উঃ। উঃ। আঃ।

শব্দ শুনে আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে গেল রাণা। এটা প্লেনের প্রায় মাঝখানটা। পেছন দিকের চেয়ে এদিকটা ভেঙ্গেছে অনেক বেশী। দেখে মনে হল ওর যেন এক অজানা দৈত্য এক থাপ্পড়ে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে সামনেটা। সেই ভগ্ন স্তূপের মাঝখানে কেমন করে যেন শুয়ে আছে এয়ার হোস্টেস তমুক্কা। ওর পায়ের আওয়াজ শুনে ককিয়ে উঠল ও।

—কোথায় লেগেছে আপনার। নিচু হয়ে বসে রাণা জিজ্ঞাসা করল।

—পায়ে। দুটো পাই আমার আটকে গেছে ধাতুর জটের ভিতরে। উঃ। আমাকে বাঁচাও ভাই। এ যন্ত্রণা আর আমি সইতে পারছি না। ককিয়ে কেঁদে ফেলল তমুক্কা। আমার দুটো পাই বোধ হয় ভেঙ্গে গেছে।

—শান্ত হোন। শান্ত হোন—এখুনি আপনাকে আমি বার করে আনছি। বলল রাণা—

সেই অন্ধকারে প্রাণ পণ করেও সে লোহার জট ছাড়াতে পারল না রাণা। মাঝ থেকে দুহাতের পাতা কেটে ফাল ফাল হয়ে গেল। একটু পরেই বুঝতে পারল যে তমুক্কা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তবু ভাল। অন্তত তাতে ওর যন্ত্রণা বোধ থাকবে না। কিন্তু বিলি করছে কি! ভাবল রাণা—ও আসছে না কেন?— একটু থামল রাণা। দু মিনিট বসে বসে হাঁপাল। পরক্ষণেই মনে হল ওর বসে থাকলে তো চলবে না। শুধু তমুক্কাই তো নয়। আরও তো অনেকে রয়েছে। তাদের খোঁজও তো করতে হবে। ভগবান যখন ওকে আর বিলিকে সুস্থ রেখেছেন তখন এ দায়িত্ব তো ওদেরই। আবার উঠে পড়ল ও। ভাবতে লাগল কি করে তমুক্কাকে বার করা যায়।

বাইরে হঠাৎ কেমন যেন আওয়াজ উঠল। একটু কান পেতে থেকে বুঝল ও। আবার বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে। হঠাৎ ভাঙ্গা প্লেনের ভিতরেও কোথায় যেন টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ করে জল পড়তে আরম্ভ করল। পরক্ষণেই হাড় কাঁপান ঠাণ্ডা হাওয়াও হু হু করে ঢুকতে লাগল ভিতরে। একটু নড়তেই পায়ের কাছে কি যেন নড়ে উঠল ওরা ঝুঁকে পড়ে দেখল কোথা থেকে যেন ভেঙ্গে পড়েছে একটা শাবলের মতন ধাতুর দণ্ড। দুহাতে সেটাই তুলে এগিয়ে গেল ও। ফাটলের মাঝখানে সেটা ঢুকিয়ে প্রাণপণে চাড় দিল। ভীষণ আওয়াজ করে ফাঁক হয়ে গেল ধাতুর জট। ঝুঁকে পড়ে আস্তে সে ধাতুর জট থেকে তমুক্কার পা দুটোকে বার করে আনল রাণা। একটা ভাঙ্গা সিটের গদি টেনে এনে রাখল ওর পায়ের নিচে। এখন ও এমনই থাক। এবার দেখতে হবে গুরুদিৎকে। টম কে। তারপরে অন্য সবাইকে। ধাতুর দণ্ডটা হাতে ধরে ও আবার সেই ভাঙ্গা সিটের পাহাড় টপকে চলে এল এপারে। ওকে দেখেই বিলি বলল—

—কি খবর ওদিকের ক্যাপ্টেন? কে কাতরাচ্ছে?

—তমুক্কা। এয়ার হোস্টেস। বোধ হয় ওর দুটো পাই ভেঙ্গে গেছে। সিন বোনের কাছে।

—হায় ভগবান। বলল বিলি। —এখানে এখন কোথায় ডাক্তার পাওয়া যাবে!

—সে কথা পরে। বলল রাণা। —আগে উদ্ধারের কাজ শেষ করতে হবে।

—সে তো নিশ্চয়ই। বলল বিলি। —এসো ক্যাপ্টেন হাত লাগাও এখানে।

অনেক কষ্টে ওরা দুজনে টেনে বার করল টম কার্পেন্টারকে।

—তোমার লাগেনিতো কোথাও? দেখ ভাল করে। বলল রাণা।

—সে দেখা পরে। আগে গুরুদিৎ। আবার তিনজনে কাজে লেগে পড়ল।

—রাত চারটে বাজে —বলল টম ওর হাতের ঘড়ি দেখে। দুর্ঘটনা ঘটার পর থেকে প্রায় ছয় সাত ঘণ্টা কেটে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সবাই আমাদের খোঁজে বার হয়ে পড়েছে।

—তা হোক তবুও আমাদের বসে থাকা চলবে না—বলল রাণা।

—হ্যাঁ কিন্তু, এমন অন্ধকারে কি করতে পারি আমরা? আগে আলো চাই। বলল টম।

—কিন্তু কোথায় পাব? জিজ্ঞাসা করল বিলি।

—বানাব। বলল টম! ছুরি আছে তোমার কাছে?

—ছিল, হারিয়ে গেছে।

—মুস্কিল হল। বলল টম। হঠাৎ রাণার হাতের দণ্ডটার দিকে তাকিয়ে বলল—ওটা দাও ক্যাপ্টেন আমাকে। আগে আমি এমারজেন্সি এস্‌কেপ ডোরটা ভেঙ্গে খুলি। বাইরের সাথে তাহলেই যোগাযোগ হবে।

দণ্ডটা এগিয়ে দিল রাণা। সেটা হাতে নিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে গেল টম। হাতড়ে হাতড়ে প্লেনের খোলসের একজায়গায় এসে প্রচণ্ড শব্দ করে সেই ডাণ্ডা দিয়ে ঠোকাঠুকি সুরু করে দিল।

একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ করে হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। দমকা একটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে সবাইকে কাঁপিয়ে দিল। সেই খোলা দরজা দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বাইরে মাথা বার করে টম বলল—

—ভগবানই আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন। নইলে এমন ভয়ানক ঘটনার পরেও কেউ উঠে দাঁড়াতে পারে?

—কিন্তু এখন আমরা করব কি? বিলি জিজ্ঞাসা করল।

—আমি নিচে নামব ক্যাপ্টেন। তোমরা ততক্ষণ যা পার কর। অন্তত গুরুদিৎকে ভুলো না।

—আলো একটা চাইই চাই। —এখুনি। এমার্জেন্সি ডোরটা বেয়ে উঠে ও লাফ দিয়ে পড়ল মাটিতে চেঁচিয়ে বলল—ভয় পেও না ক্যাপ্টেন। আমি ফিরব এখুনি।

ওরা দুজনে মুখ বুজে সেই ধাতুর ডাণ্ডাটা দিয়ে একটার পর একটা ধাতুর জট ছাড়িয়ে চলল। এক সময়ে বহু কষ্টে ধরাধরি করে গুরুদিতের অজ্ঞান দেহটাকে টেনে বার করল ধ্বংস স্তুপের ভিতর থেকে। ওর বুকের উপর কান পেতেই বিলি চেঁচিয়ে উঠল।

—বেঁচে আছে ক্যাপ্টেন। গুরুদিৎ বেঁচেই আছে।

ধরাধরি করে ওরা দুজনে গুরুদিৎকে এক পাশে শুইয়ে দিল। আঘাত যে কোথায় লেগেছে ওর বোঝা যাচ্ছে না —একেবারে বেহুঁস অজ্ঞান।

গুরুদিৎকে শুইয়ে দিয়ে ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে—হঠাৎ প্লেনের অন্যদিক থেকে কে যেন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল —আমি কোথায়। আমি কোথায়। উঃ আমার জল তেষ্টা পেয়েছে। কোথায় আমি বলনা?

এ গলা শুনেই রাণা বলল —রাধারাণী দাস। চল বিলি ওদিকে এখুনি। ও একটুতেই খুব ভয় পেয়ে যায়। এখুনি চল। শুনছ না ওর গলার স্বর।

ওরা প্লেনের শেষের দিকে এক কোণে ভয়ে জড়োসড়ো রাধারাণীকে বসে থাকতে দেখল। ওদের দেখতে পেয়েই রাধারাণী কাঁপা গলায় বলল—জল খাব।

এঃ তুমিতো দেখছি শীতে কাঁপছ।—বলল বিলি। চট করে নিজের কোটটা খুলে এগিয়ে ধরে বলল—এটা পরে ফেলতো বোন লক্ষীটি।

হাত বাড়িয়ে কোটটা নিল রাধারাণী। সেটা কোনমতে পরেই বলল।— জল খাব।—

রাণা বলল—জল এখন কোথায় পাবে বল। দেখছনা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে।—এখন ওসব কথা ভুলে গিয়ে অন্যদের খুঁজে বার করতে হবে।—জল পরে খাবে। রাণা যেন ধমকে দিল। সে ধমকে থমকে গেল

রাধারাণী। ওর কাঁপুনিও যেন একটু কমল। আস্তে আস্তে ও বলল—ওদিকের কোণে বসে আছে আমিনা। ওর খুব লেগেছে। রক্তও পড়ছে। ওকে দেখ।—আমি আর জল খেতে চাইব না।

—লক্ষ্মীটি। বলল রাণা। তারপর ওরা এগিয়ে গেল আমিনার দিকে। ভয়ে কেমন যেন জড়োসড়ো হয়ে গেছে আমিনা—কোথায় লেগেছে তোমার?—নিচু হয়ে ওর মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল—বিলি।

কেমন যেন অসহায় মুখ তুলে তাকাল আমিনা।

—টম আলো নিয়ে আসছেনা কেন?—বলল রাণা।—আলো না হলে সত্যিই তো কিছু বোঝা যাবেনা। বিলি বলল—তুমি ভয় পেওনা বোন। আমরা তো আছি। বল তোমার কোথায় লেগেছে? বল?

—ডান দিকের পায়ে আর হাতে। অনেক কষ্টে ব্যথার কান্না চেপে বলল আমিনা।

—কই দেখি? বিলি আর রাণা দুজনেই একসাথে বসে পড়ল ওর পাশে।

দেখল—সত্যি হাত আর পায়ের অনেক খানিকটা জায়গার মাংসই ভীষণ ভাবে ছিঁড়ে গিয়েছে।—ব্যাণ্ডেজ চাই। বলল—রাণা।—আর ওষুধ। ফাস্ট্ এইডের বাক্স কি কিছু থাকেনা প্লেনে?

এমন সময়ে এমার্জেন্সি দরজার কাছে যেন কিসের আওয়াজ শোনা গেল।

—টম ফিরেছে।—বলল বিলি।

বাইরে থেকে টম ডাকল—ক্যাপ্টেন্।

—হ্যাঁ, কি কি বল—? এগিয়ে গেল রাণা। বাইরে তখন বৃষ্টি থেমেছে।

—ভাল খবর আছে।—প্লেনটা দুটুকুরো হয়ে ভেঙ্গে গেছে। আমরা আছি পিছনের অংশে। সামনের অংশের সকলেই ভাল আছে।

—কিন্তু এখানে তো আমিনা, গুরুদিৎ আর তমুক্কার খুব চোট লেগেছে। এখুনি কিছু করা দরকার।

—তবে আমি মুংলিকে ডেকে আনি এখুনি। ও ফার্স্ট এইড দিতে জানে। ও এদের দেখুক।

—হ্যাঁ কিন্তু ওষুধ পত্র। ব্যাণ্ডেজ?

—সব ঠিক হয়ে যাবে ক্যাপ্টেন। আলো নিয়ে আসছি আমি এখুনি। তোমরা ততক্ষণ ওদের দেখ। আবার চলে গেল টম।

বিলি বলল—শুনলে তো আমিনা?—আর ভয় পেওনা। এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে। ওরা আলো নিয়ে এই এলো বলে। সঙ্গে ওষুধ পত্র ব্যাণ্ডেজ সব থাকবে।

রাণা ততক্ষণে ওর গায়ের সার্টটা খুলে ফেলেছে বলল—এস বিলি এটা ছিঁড়ে আমরা কিছু ব্যাণ্ডেজ বানিয়ে আমিনার হাতে পায়ে বাঁধি।

কিন্তু তা করার আগেই আবার বাইরে টমের গলা শোনা গেল—ক্যাপ্টেন।

—হ্যাঁ কি বল?

আমরা এসে গেছি। জিনিস গুলো এগিয়ে এসে তুলে নাও উপরে।

দরজার কাছে এগিয়ে গেল বিলি আর রাণা। দেখল বাইরে দরজার কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কজন। অন্ধকারে দেখে ওরা কাউকেই চিনতে পারল না।

—কি আছে দাও। বলল রাধা। দু তিনটে ট্র্যাভেলার্স ব্যাগ ভর্তি জিনিস টেনে উপরে তুলল ওরা। বিলি জিজ্ঞাসা করল—মুংলি এসেছে? হ্যাঁ। উত্তর দিল টম।—কিন্তু উঠবে কি করে?—হামিদুল আর কুণাল গেছে তার ব্যবস্থা করতে তাড়াতাড়ি ওদের আসতে বলেছি।

ওরা দুজনে ফিরল একটা মোটা গাছের ডাল টানতে টানতে। সেটাকে প্লেনের গায়ে লাগিয়ে দাঁড় করান হল মইএর মতন করে মুংলি বলল—এতেই হবে। ক্যাপ্টেন তুমি আমার হাতটা ধর।

হাত ধরে ওকে একরকম টেনেই ভিতরে তুলে নিল রাধা আর বিলি।

—আলো এনেছ? জিজ্ঞাসা করল বিলি।

হ্যাঁ—বলল মুংলি। একটা ব্যাগের মধ্যে দুটো টর্চ আছে। কোথায় আমিনা?

—এসো এদিকে।

পর পর ডাল বেয়ে ভিতরে উঠে এল হামিদুল। কুণাল আহতদের এক এক করে সবাইকেই দেখল। দেখল মুংলি। তখন ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন পাকা ডাক্তার। তাড়াতাড়ি দেখা শেষ করেই ও আগে ওষুধ দিয়ে আমিনার আঘাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। কুণাল আর হামিদুল সাহায্য করল ওকে।

ব্যাগের ভিতর থেকেই বার হল দুটো বড় টর্চ। তার আলোতেই কাজ সারলো মুংলি। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হতেই—ওদিকে আবার শোনা গেল তনুক্কার গলার কাতর আওয়াজ। কিন্তু তাতে যেন তেমন কানই দিল না মুংলি—বলল—আমিনার শোবার ব্যবস্থা কর এখুনি।

বিলি আর হামিদুল—দুজনে তার ব্যবস্থায় লেগে গেল। একটা সিটকেই ওরা ঝেড়ে সাফ করল। আস্তে তার উপরে শুইয়ে দিল আমিনাকে।

—ওর গায়ে ঢাকা দাও। বলল মুংলি।

তাড়াতাড়ি হামিদুলও ওর কোটটাও খুলে ওকে ঢাকা দিল।

—এবারে ওকে কিছু খেতে দাও গম্ভীর ভাবে হুকুম দিল মুংলি। কুণাল ওর প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করল এক মুঠো টফি আর লজেন্স। তাই এগিয়ে দিল আমিনার দিকে।—বলল—নাও খাও যত পার।

—আমার ভাবনা গুরুদিৎ কে নিয়ে! বলল মুংলি।—চল, এবারে আগে ওকে দেখি গিয়ে।

সবাই চলে আসছিল ওর পিছন পিছন। ধমকে উঠল মুংলি। বলল—কুণাল তুমি থাক আমিনার কাছে। সবাই চলে গেলে চলবে কেন।

গুরুদিৎকে যেমন শুইয়ে দিয়েছিল—ঠিক তেমনিই শুয়ে আছে ও। টর্চের আলোয় খুব ভাল করে ওকে পরীক্ষা করল মুংলি। তারপর হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে বলল—না তো কোথাও কোন আঘাত লেগেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

—তাহলে উপায়! ব্যস্ত হয়ে হামিদুল বলল।

—এক কাজ করা যাক।—অনেক ভেবে বলল মুংলি।

—কেউ একটা রুমাল ভিজিয়ে আনুক। চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে দেখা যাক। যদি ভয়ে কিম্বা ঝাঁকানির জন্য অজ্ঞান হয়ে থাকে তো তাতে কাজ দেবে। ছুটল হামিদুল আর টম তাদের রুমাল ভিজিয়ে আনতে। বার চার পাঁচ ভাল করে গুরুদিতের চোখে মুখে জলের ছিটে দেওয়া হল। চোখের পাতাও যেন নড়ল একটু ওর। উৎসাহে ওরা আবার ছুটিল বাইরে।—শেষ পর্যন্ত সত্যি গুরুদিৎ চোখ মেলে চাইল—ওদের সবাইকে ওর চারপাশে অমন ব্যগ্র হয়ে বসে থাকতে দেখে বলল—কি হয়েছে আমার? আমি কি অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। আমার কি চোট লেগেছে?

—না কিছু হয়নি তোমার—খুব শান্ত গলায় উত্তর দিল মুংলি।

—তুমি এখন ভাল আছ গুরুদিৎ। এখন কিছু টফি খেয়ে একটু বিশ্রাম কর শুয়েই। উঠোনা যেন। বুঝলে?

—আচ্ছা। বলল গুরুদিৎ হামিদুলের হাত থেকে টফি নিতে নিতে—

তমুক্কার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা সকলে। তমুক্কার জ্ঞান ততক্ষণ ফিরে এসেছে। আবার ওদের সবাইকে একসাথে দেখে একটু যেন খুশিই হল ও। তবুও যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। ওর পাশে বসে পড়ে দুটো পাই ভাল করে পরীক্ষা করল মুংলি। তার পর ওর হুকুমে হামিদুল টম, বিলি আর রাণা এদিকে ওদিক ছুটো ছুটি সুরু করল। এটা আন। ওটা দাও এটা ধর। সব শেষে তমুক্কাকে সকলে ধরা ধরি করে এনে শুইয়ে দিলে একটু সমতল জায়গায়। ডাক্তারির চোটে ও তখন আবার অজ্ঞান, তবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা দুটোকে ছড়িয়ে শুতে পারল তমুক্কা।

মুংলি বলল—এবারে তোমরা সবাই এক কাজ কর। গুরুদিৎ আর আমিনাকেও সাবধানে নিয়ে এস এখানে। ওরা এক সাথে থাকলে আমার পক্ষে দেখাশুনা করার সুবিধা। তাছাড়া এখানে জায়গাও অনেক।

—চল ক্যাপ্টেন আমরা তাই করি! বলল বিলি।

সব কাজ মিটল যখন তখন বাইরের জঙ্গলে পাখির ডাক সুরু হয়ে গেছে।

হামিদুল বলল—আমরা কি এখন একটু বসব ক্যাপ্টেন? না অন্য কোন কাজ আছে?

মুংলি বলল—না এখন কিছুক্ষণ কোন কাজ নয়! সবাই বস। অনেক কিছু আলোচনা করার আছে।

রাণা বলল—হ্যাঁ— কাজ আমাদের অনেক। তবে তার আগে কেমন করে তা করব আমরা, তা আলোচনা করে নেওয়াই ভাল।

—ঠিক তাই। বল টম।—চল এখান থেকে সরে গিয়ে আমরা একটু ওদিকে বসি।

—বেশ প্রথমে তাহলে আমরা আমাদের একজন দলপতি ঠিক করি।

—সে তো আছেই। সবাই এসে বসল—এক পাশে

—হ্যাঁ তাকেই আমরা সবাই মানব। ওরা বলল।

বেশ—রাণা বলল—তবে এসো তাহলে আমরা সব কাজ ভাগ করে নিই।—এক এক কাজ একজনে দায়িত্ব নিয়ে করবে।

মুংলি বলল আমি গার্ল গাইড থাকার সময়ে ফার্স্ট এইড শিখেছি। আমি সব আহতদের দেখাশুনা করব।

—বেশ তুমিই তাহলে আমাদের ডাক্তার। সাহায্য আসার সময় পর্যন্ত সবার ভার তোমার উপরে। বিশেষ করে ওদের তিনজনের।

—ঠিক আছে ক্যাপ্টেন।—গম্ভীরভাবে চলল মুংলি। কথার ফাঁকে তখনও ব্যাণ্ডেজ পাকিয়ে চলেছে।

মুংলি থামতেই—মাথা চুলকে টম বলল—তুমি তো জান ক্যাপ্টেন আমি N.C.Cর এয়ার উইংস্ এর লোক। তাছাড়া—ছেলেবেলা থেকে প্লেনের ব্যাপারে নেশা আমার। প্রায় সব প্লেনের সব কিছু আমি জানি বইএ পড়ে পড়ে। এখন এই একসিডেণ্ট হওয়ার পর আমাদের কি করা উচিত তা বোধ ঠিকভাবে আমিই শুধু জানি।—আমার মনে হয় সাহায্য এসে পড়ার আগে পর্যন্ত সমস্ত উদ্ধার কাজটা আমার মত মতন হওয়া ভাল।

—নিশ্চয়ই। বলল—রাণা।—সে ব্যাপারে তো আমরা সবাই তোমার কথাই মেনে চলব।—সন্দেহ কি এতে!

হামিদুল বলল—আরও একটা কাজ বাকি রইল ক্যাপ্টেন। সাহায্য কখন আসে তারতো কোন ঠিক নেই। ততক্ষণ আমাদের খাওয়া দাওয়া তো চালাতে হবে প্লেনে যা আছে তাই দিয়েই। তাই এখুনি—সব কিছুর হিসাব নিয়ে—র‍্যাশন করে দিতে হবে। নইলে পরে বিপদ হবে।

—ঠিক বলেছ হামিদুল।—বলল রাণা।—তুমি নিলে তবে সে ভার। ও ব্যাপারে তুমি যা বলবে তাই সবাই মেনে নেবে।—তুমি আমাদের খাদ্য ভাণ্ডারী।

টম বলল—ভোর হলেই আমাদের একদলকে বার হয়ে পড়তে হবে দেখবার জন্য আমরা কোথায় আছি।

বিলি ব্যস্ত হয়ে বলল--সে ভার তবে আমি নিলাম ক্যাপ্টেন।—আমাকে এ কাজ করতে দেওয়া হোক।

বেশ তাই হবে। বলল রাণা—তবে খুব সাবধান। আমরা একটা গভীর জঙ্গলের উপর দিয়ে উড়ে আসছিলাম। যদি জঙ্গলেই পড়ে থাকি তো হিংস্র জন্তুর ভয় থাকতে পারে।

বিলি বলল—আমি খুব সাবধানে কাজ করব ক্যাপ্টেন।—তুমি ভেব না।

কুণাল এতক্ষণ চুপ করে দিল।—গম্ভীরভাবে বলল—তোমরা সবাই তো সব কাজ ভাগ করে নিলে। আমি তাহলে করব কি?—আমি কি শুধু বসেই থাকব?

মুংলি বলল—বাঃ তা কেন। তিন তিনটে এক্সিডেণ্ট কেস কি আমি একলা সামলাতে পারব? তুমি থাকবে আমার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট।—বুঝলে?

—আচ্ছা।—খুসি হয়ে বলল—কুণাল। আমি রাজি। এমন সময় ওদিক থেকে তমুক্কার গলা পাওয়া গেল।—শোন তোমরা।

ওরা সবাই উঠে পড়ল।

রাণা বলল—হামিদুল—বেশ ভোর হয়ে গেছে। তুমিই আগে তোমার কাজ সুরু করে দাও।—রুক্মিণী, শান্তা আর শকুন্তলা রইল তোমার সাথে।—মনে রেখ সবাই ক্লান্ত।—সবারই খিদে পেয়েছে তাছাড়া তিনজন আহত। আর তোমার উপরেই নির্ভর করছে বিলির তাড়াতাড়ি বার হওয়া।

—ঠিক আছে ক্যাপ্টেন আমি এখুনি কাজে লেগে পড়ছি, বলল হামিদুল।—বলে ও আর দাঁড়াল না—গাছের ডাল বেয়ে নেবে চলে গেল বাইরে।

—প্রথমে আমি তোমাদের ধন্যবাদ দেব। বলল তমুক্কা—কারণ এত বড় বিপদেও তোমরা ভয়ে মুষড়ে পড়নি তাই। তাছাড়া তোমরা আমার জন্য যা করেছ তার জন্যও। কিন্তু এস—সবার আগে আমরা সবাই ধন্যবাদ দিই ভগবানকে।

দু মিনিট ওরা চুপ করে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তমুক্কা ওদের ধর্মের অনুশাসন থেকে কিছু মুখস্থ বলল জোরে জোরে। ওরা নমস্কার করল ভগবানের উদ্দেশ্যে।

—একটা কথা কিন্তু তোমরা সবাই ভুলে গেছ।—বলল তমুক্কা।—তোমরা কি কেউ ককপিটের লোকগুলোর কথা ভেবেছ! লজ্জা পেয়ে রাণা যেন কি বলতে যাচ্ছিল। হাত তুলে ওকে থামিয়ে টম বলল—হ্যাঁ তাদের কথাও আমাদের মনে আছে।

—কোথায় তারা?

—তারা আর কেউ ফিরে আসবেনা আমাদের মাঝখানে—একথা শুনে যেন কেমন হয়ে গেল তমুক্কা। কোন মতে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে তার কান্না সামলাল।

কি হয়েছে তাদের?

আমাদের বাঁচাতে গিয়ে তারা প্রাণ দিয়েছে। বলল টম।

—খুলে বল আমাকে সব! কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তমুক্কা বলল—তুমি কি দেখেছ বল।

—বোধ হয় বাজ পড়েছিল প্লেনে। তাই প্লেনের কনট্রোল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন আর পাইলট তবুও প্লেনকে কোন খোলা জায়গায় নাবাবার চেষ্টাই বোধ হয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্লেনকে যেখানে নাবান—সে জায়গা এত ছোট যে প্লেনের প্রচণ্ড গতিবেগ থামাতে পারেন নি। দু টুকরো হয়ে যায় প্লেন

প্রথম গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে। সামনের অংশ গিয়ে আছড়ে পড়ে একটা পাহাড়ে ঢিপির গায়ে। কক পিট আর রেডিও অফিসারের ঘর চুরমার হয়ে গেছে। ওরা ওদের সিটেই বসে আছে। আমি দেখে এসেছি। কিন্তু আমাদের আর এখন কিছুই করার নেই।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তনুকা। কাছে গিয়ে মুংলি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

রাণা বলল—এসো আমরা সবাই ওদের জন্যও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। আমরা যেন কোন দিনও ভুলে না যাই ওদের কথা।

কান্না-ভরা গলায় তনুকা আবার প্রার্থনার মন্ত্র বলল। বাইরে তখন বেশ ফর্সা হয়ে গেছে!

গুরুদিৎ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বলল ডাক্তার দিদি আমি কি এখন উঠব? এখন তো আমি ভাল আছি।

—সত্যি ভাল আছ? জিজ্ঞাসা করল মুংলি।

—হ্যাঁ খুউব।

—বেশ তো তবে ওঠো।

হুকুম পেয়ে খুসিতে ভরে উঠল গুরুদিতের মুখ—তাড়াতাড়ি ও উঠে বসতে গেল। কিন্তু সমস্ত শরীরটাই শুধু বার কতক কেঁপে উঠল ওর। উঠতে পারল না ও, ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

—এ কি হয়েছে আমার ডাক্তার দিদি? একি হয়েছে আমার? ভয় পেয়ে অসহায়ের মতন গুরুদিৎ ওর হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। দুহাতে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল মুংলি।

—ও কিছু না ভাই। ও কিছু না। তুমি আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর। দেখবে তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ঠিক হবে তো? আমি আবার চলতে পারব তো ডাক্তার দিদি?

—নিশ্চয় ভাই। নিশ্চয়ই। আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল মুংলি।

—ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন—বাইরে কারা যেন ডাক দিল।

—কে?—এগিয়ে গেল রাণা।

—আমরা এসেছি। আমি, শকুন্তলা, শান্তা আর রুক্মিণী। হামিদুল পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের। আমরা এখন এখানে ডিউটি দেব। তোমরা যাবে বিশ্রাম করতে।

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকাল রাণা। দেখল ওরা খালি হাতে আসেনি। সঙ্গে এনেছে নানান জিনিস পত্র। খাবার, বিছানা। এমন কি কতগুলো ম্যাগাজিন পর্যন্ত।

—তোমরা যাও। বলল মুংলি। আমার এখন যাওয়া চলবে না। কুণাল তুমিও যাও। তুমি কিন্তু ফিরবে তাড়াতাড়ি।

রাণা ব্যস্ত হয়ে বলল—তা কি করে হয়? তুমিও তো কম ক্লান্ত নও?

—এখন ডিউটি ফেলে যাওয়া ঠিক নয়। গম্ভীর ভাবে বলল—মুংলি।

তনুকা বলল—ঠিক কথাই তো বলেছে ও। তোমরা যাও ভাই। তোমাদের বিশ্রাম খুব দরকার।

কুণাল বলল—বেশ আমি এলে তুমি যাবে কিন্তু।

—আচ্ছা। বলল মুংলি।

দরজার কাছে আবার এগিয়ে গেল রাণা আর টম। একটা একটা করে জিনিসগুলোকে টেনে তুলল ভেতরে

ওরা। তারপর ঠেলে তুলল শকুন্তলা, শান্তা আর রুক্মিণীকে।

সাবধানে থেকো। বলল রাণা।

—কোন ভাবনা কোর না। বলল মুংলি। হাতে তখন ওর ধোঁয়া ওঠা গরম দুধের গ্লাস। গুরুদিতের মাথার কাছে গিয়ে বসল ও। শকুন্তলাকে ডেকে বলল—আমিনাকেও শিগ্‌গির এক গ্লাস গরম দুধ দাও আগে। তারপর রাধারানীকে।

ওরা সবাই এক এক করে গাছের ডাল বেয়ে নেবে এল নিচে। বাইরে তখনো জোলো আবহাওয়া—কুয়াশাও ঘন চারদিকে। নাবতেই কেমন যেন শীতের কাঁপুনি ধরল রাণার।

বিলি বলল—এ যে দেখছি জমে যাবার উপক্রম হল।

শিগ্‌গির চল টম।

টম বলল—আমিতো ভাবছিলাম আগের অংশে ঢোকার আগে প্লেনের চারপাশটা একবার ঘুরে দেখব।

—বাঃ, বেশ তোমার বুদ্ধি—আমাদের জমিয়ে মারতে চাও নাকি? বলল বিলি।

—হ্যাঁ সত্যি। হঠাই বাইরে বার হয়ে কাঁপুনিটা ধরেছে খুব বেশী। হেসে বলল রাণা—বেশ ক্যাপ্টেন তাহলে যে এদিকে এগিয়ে চলল টম। তার পিছনে ওরা সবাই।

কুণাল বলল—গাছগুলো কি বড় বড় দেখেছ ক্যাপ্টেন।

—হ্যাঁ, আকাশ দেখা যাচ্ছে না। বলল বিলি।

—তার মানে কিন্তু—আমরা যে কোথায় আছি ওপর থেকে দেখে কেউ জানতেও পারবে না। একটু ভেবে বলল রাণা।

—ঠিক হল না ক্যাপ্টেন—বলল টম।

—কেন?

—প্লেন যেখানে প্রথম মাটি ছুঁয়েছে, আকাশ থেকে সে জায়গাটাকে অতি সহজেই চেনা যাবে। সুতরাং আমরা যে কোথায় আছি এ সম্বন্ধে ওদের মোটামুটি ধারণা কুয়াশা কেটে গেলেই হবে। তবে কি তুমি কি বলতে চাও……রাণাকে কথাটা শেষ করতে দিল না টম—বলল।

—হ্যাঁ তুমি যা ভাবছ ক্যাপ্টেন ঠিক তাই।

বিকাল নাগাদই আমরা টাণ্টামোরা সহরে পৌঁছে যাব। তুমি দেখ।

—কি করে তা সম্ভব!

—কেন! হেলিকপ্টর উড়বে! হেসে বলল টম।

—তাই যেন হয় ভগবান। করুণভাবে বলল রাণা—তিনজন আহত রয়েছে আমাদের সঙ্গে।

কুয়াশার ভিতর দিয়ে হামিদুলের গলা শোনা গেল।

—ব্যাপার কি! তোমরা কি কুয়াশায় দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি? এদিকে কফি তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

—কফি! বিলি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

—হ্যাঁ। সুধু কফি নয়। সঙ্গে অন্য কিছুও আছে।

আর করতে হল না। টম এর পিছন পিছন ওরা প্রায় দৌড়েই ঢুকল এসে প্লেনের সামনের অংশটাতে।

—কই কি আছে দাও শিগ্‌গির। ব্যস্ত হয়ে বলল বিলি। আমার যা খিদে পেয়েছে।

কাগজের গ্লাসে এক এক গ্লাস গরম কফি আর সঙ্গে স্ন্যাকস্ এগিয়ে ধরল হামিদুল।

—পেলে কোথায় এসব? গোগ্রাসে খেতে খেতে রাণা জিজ্ঞাসা করল।—উঃ তুমি আমাদের বাঁচালে ভাই।

—প্লেনে কি কিছুর অভাব আছে। হেসে বলল হামিদুল। তবে হ্যাঁ ধন্যবাদ দেবে তো দাও আমার এ্যাসিট্যাণ্ট রাজা বাবুকে। ওই খুঁজে খুঁজে সব বার করেছে। ও না থাকলে কিছুই হত না।

ছোট্ট রাজা সোম এক কোণ থেকে এগিয়ে এসে একগাল হেসে বলল—বারে করব না বুঝি এসব। আমরা যে এখন সবাই সেই সুইস্ রবিনসনদের মতন দ্বীপে এসে উঠেছি। এখন সবাইকেই সব কাজ করতে হবে ঠিক ঠিক। নইলেই ভীষণ বিপদ। আচ্ছা হামিদুল দা এখানে কি জংলিরা আছে? বল্লম হাতে! সবাই হেসে উঠল প্রাণ খুলে। কফি শেষ করল বিলি।

তারপর উঠে আড়মোড়া ভাঙ্গল। ওর যাবার সময় হয়েছে। ওকে উঠতে দেখেই রাণা জিজ্ঞাসা করল—তুমি রেডি?

—হ্যাঁ ক্যাপ্টেন।

—বেশ এগোও। বলল রাণা। দেখবে কোথাও কাছে লোকালয় আছে কিনা।

—একটা, কথা। বাধা দিল টম। যাচ্ছ যাও কিন্তু সব সময়েই মনে রাখবে খুব বেশী দূরে যাওয়া উচিত হবে না। আর একলা যেও না!

—হামিদুল বলল—ক্যাপ্টেন। আমার নিজের ডিউটি তো আবার সেই দুপুরে। সে আমি ঠিক ফিরে এসে করব। এখন তোমার মত পেলে আমিও যাই।

বেশ তো যাও। বলল রাণা।

—আমিও যাব। গম্ভীরভাবে বলল রাজা সোম।

—তুমিও!

একটু চিন্তায় পড়ল রাণা। কারণ রাজাই এদের মধ্যে সব থেকে ছোট। বয়স মাত্র আট। কিন্তু রাণা কে একটুও ভাবতে দিল না রাজা। বলল—আমাকে যেতেই হবে ক্যাপ্টেন। দেখতে হবে কোথায় নেবেছি আমরা। এটা দ্বীপ না মহাদেশ।

আবার সবাই হেসে উঠল এক সাথে।

রাজা জিজ্ঞাসা করল: যাব ক্যাপ্টেন?

—কিন্তু যদি কোন বিপদ হয় পথে। ভাবনায় পড়ে রাণা বলল।—তুমি যে বড্ড ছোট।

—বারে আমিই বুঝি খালি ছোট। আর তোমরা সবাই বড়। যাও, যাব না আমি, যাও। রাগ করে ও আবার ভিতরের এক অন্ধকার কোণের দিকে চলে গেল।

—শোন শোন। ব্যস্ত হয়ে ডাকল রাণা।

—না যাব না আমি। রাগ করে উত্তর দিল রাজা।

—আচ্ছা। আচ্ছা। রাগ করতে হবে না তোমাকে।—তুমিও যাও ওদের সঙ্গে। হেসে বলল রাণা।

—ঠিক বলছ! ছুটে এল রাজা।

হ্যাঁ। কিন্তু এ দলের দলপতি বিলি মনে থাকে যেন। ওর কথা মানতে হবে সবাইকে।

—নিশ্চয়। এক সাথে হামিদুল আর রাজা বলে উঠল।

—তবে আর দেরী নয়। বার হয়ে পড় তোমরা।

—নিশ্চয়ই। এখুনি।

বিলির পিছন পিছন। হামিদুল আর রাজা এক এক করে বার হয়ে গেল বাইরে।

—কুণাল বলল—আমিও চলি ক্যাপ্টেন। আমি গিয়ে মুংলিকে পাঠিয়ে দেব।

—হ্যাঁ যাও। যাবার সময়ে সঙ্গে কিন্তু খাবার নিয়ে যাও। যদি ও আসতে না চায়।

—সেই ভাল ক্যাপ্টেন। বলল টম।

খাবারের প্যাকেট আর গরম কফির পট হাতে করে কুণাল চলে গেল। ও চলে যেতেই টম বলল—আমরা এখন কিন্তু দশ মিনিট বিশ্রাম করব ক্যাপ্টেন। তারপর খুঁজে দেখব—প্লেনের ভিতর থেকে আরও কিছু খাবার, ওষুধ, দরকারি জিনিস বার করতে পারি কি না।

—বেশ তাই হবে। উত্তর দিল রাণা।

প্লেনের কাছ থেকে কয়েক-পা এগিয়ে এসেই থমকে দাঁড়াল বিলি।—কি ভীষণ কুয়াশা দেখেছ হামিদুল!

—হ্যাঁ এ যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। উত্তর দিল হামিদুল।

—আমরা নিশ্চয়ই বেশ উঁচু জায়গায় আছি। একটা মালভূমি হতে পারে। দেখছ না কেমন ঠাণ্ডা। রাজা—আমার মনে হচ্ছে এ কুয়াশা সহজে কাটবে না।

—তাহলে উপায়? জিজ্ঞাসা করল হামিদুল।

—ফিরে গিয়ে তো শুধুই বসে থাকা—বলল বিলি।

—তার থেকে চল আস্তে আস্তে এগোই।

—হ্যাঁ সেই ভাল। হামিদুল বলল—যদি কাছে কোথাও লোকজন থাকে তো দেখা হয়েও যেতে পারে।

—চল তবে এসো—বলে রাজা তার বেল্ট থেকে স্কাউটের ছুরিটা খুলে হাতে নিল। ওটা দিয়ে আমি গাছের গায়ে দাগ দিয়ে এগোবো যাতে ফিরবার সময় পথ না হারাই।

—কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য থাকবে কি? প্রশ্ন করল বিলি।

—সবাই একটা করে মোটা দেখে গাছের ডাল তুলে নাও হাতে। বলল—হামিদুল।

তাই করল ওরা। কুয়াশার মধ্যে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। আসে পাশে কোন ছোট গাছের চিহ্ন নেই। দুপাশে যতদূর দেখা যাচ্ছে—মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি সার বেধে দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশা ছাড়িয়ে তাদের মাথা যে আকাশের কতদূরে উঠে গেছে তা ওরা বুঝতেই পারল না সে গুঁড়ির উপরে দাগ দেবার প্রাণপণ চেষ্টায় রাজা হাঁপিয়ে উঠল। চারদিক নিঃস্তব্ধ তার মাঝে ওদের পায়ের শব্দই শুধু শোনা যেতে লাগল

কোথাও কোন লোকজন নেই বলেই মনে হচ্ছে।

—আমরা কতদূর এলাম? জিজ্ঞাসা করল হামিদুল।

—চার পাঁচ কিলোমিটার হবে বোধ হয়। বলল বিলি।

—আর এগোনো কি ঠিক হবে? জিজ্ঞাসা করল হামিদুল।—টম কি বলেছে মনে আছে তো?

—হুঁহে। এসো আমরা এবারে বাঁদিকে ফিরি। বলল বিলি। বাঁ দিকে দু-এক কিলোমিটার গিয়েই আজকের মতন আমরা ফিরব। বুঝলে।

নিঃশব্দে ওরা বাঁদিকে মুখ ফেরাল। একটু এগিয়ে এসেই লক্ষ্য করল জঙ্গলের রূপ যেন ক্রমে বদলে যাচ্ছে। সেই বিরাট বিরাট গাছগুলোর ভীড় বেশ কমে এসেছে। চারপাশে ছোট গাছের জঙ্গল কখন যেন সুরু

হয়ে গেছে। ক্রমে ঝোপ ঝাড়ও দেখা দিতে লাগল। পায়ের নিচের রুক্ষ শুষ্ক মাটির বদলে দেখা দিল স্যাঁতসেঁতে মাটি, সবুজ ঘাস আর জায়গায় জায়গায় শ্যাওলা।

—সাবধান। বলল বিলি। ঝোপ জঙ্গলে জন্তুর ভয় থাকতে পারে। আমরা কি আর এগোবো।

—না। বলল হামিদুল। আমার মনে হচ্ছে আমরা কোন জলার দিকে এগিয়ে চলেছি। দেখছ না গাছপালাগুলো কেমন বদলে গেছে। কিন্তু জন্তু জানোয়ারের উপদ্রব?

—আবার জলের ধারেই তো মানুষও থাকতে পারে। গম্ভীর ভাবে মন্তব্য করল রাজা।

বিলি বলল—হ্যাঁ এ কথাও তো ঠিক!

—হামিদুল বলল—কিন্তু কোন অস্ত্র তো নেই আমাদের হাতে। যদি কোন বিপদ হয়। তবে?

—ভয় পাচ্ছ মিছি মিছি। মানুষ করবে কি! হেসে বলল রাজা।

—কি জানি সে মানুষগুলো তো একেবারে জংলীও হতে পারে।

—কি করবো তাহলে?

—ফেরা উচিত এখন। কুয়াশা কাটলে আবার আসব।

রাজা ব্যস্ত হয়ে বলল আমি একটা কথা বলতে পারি।

—বল। বলল বিলি।

—ফিরে না গিয়ে এসো এখানে দাঁড়িয়ে আমরা কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করি। জন্তু বা মানুষ যাই থাকুক না কেন কাছে তাদের সাড়া পাওয়া যাবে তাহলে।—যদি বিপদ দেখি পালাব ছুটে।

—বেশ। তাই কর। কিন্তু পিছন ফিরে দৌড়াবার জন্য রেডি থেকো।

সবাই ওরা হেসে উঠল—তারপর প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল ওদের জানা সবকটা ভাষাতেই।

—কেউ কোথাও আছ? আমরা বড় বিপদে পড়েছি। সাহায্য চাই।

ওদের সাড়া পেয়ে ডানা ঝাপটে এদিক ওদিক থেকে গোটা কয় জংলী পাখি সুধু উড়ে চলে গেল। ওরা থামতেই চারিদিক আবার নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল। মানুষ বা জন্তু কোন কিছুরই সাড়া পাওয়া গেল না আর।

—চল এগোই। বলল রাজা খুসি হয়ে। কোথাও কোন ভয় নেই।

—তাই মনে হচ্ছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দিল বিলি।

—আমার মন কিন্তু সায় দিচ্ছে না তবুও। বাধা দিয়ে বলল হামিদুল। ও হাতের গাছের ডালটাকে বাগিয়ে ধরে। দেখছ না চারিদিক কেমন থম থমে। কোন কিছুর সাড়া নেই কোথাও। এমন কি পাখিগুলোও ডাকছে না।

—ও তো আমাদের ভয়ে। হেসে বলল বিলি।

—তবে তো ওরা মানুষ চেনে বোঝা যাচ্ছে। একটু ভেবে বলল রাজা।

—তবে কি এ জঙ্গলে মানুষের আনাগোনা আছে। চিন্তিত ভাবে বলল হামিদুল।

—নিশ্চয়ই আছে। আর সে মানুষ আমাদের মতন সভ্য। কারণ সে নিশ্চয়ই বন্দুক হাতে করে শিকার করে। আর সেই বন্দুকের ভয়েই পাখিগুলো আমাদের দেখেও ভয় পাচ্ছে। বলল রাজা।

—তবে আর ফেরার কথা ভাবা চলবে না। বলল বিলি। সে লোক কে আমাদের জানতে হবে। আর তা হত তাড়াতাড়ি জানা যায় ততই ভাল।

—বেশ তাহলে চল এগোই। সাহস পেয়ে বলল হামিদুল।

—হ্যাঁ। কিন্তু সাবধান। সে মানুষটা যে কেমন তাই বা কে জানে? বিলি বলল

—মনে রেখ তার হাতে বন্দুক আছে। হঠাৎ মুখোমুখি হওয়া ঠিক হবে না।

রাজা বলল বেশ তো এসো আমরা নিঃশব্দে এগোই। কিন্তু কোন দিকে?

—ঠিক দিকেই তো চলেছি আমরা। বিলি জবাব দিল। নদীর ধারে পৌঁছাতে পারলেই অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে। আসেপাশে মানুষ থাকলে বোঝা যাবে।

—সেই ভাল। বলল হামিদুল।

ওরা সন্তর্পণে এগোতে লাগল। বড় গাছগুলো ক্রমেই কমছে। শেষ পর্যন্ত ওরা এসে পৌছাল ঘন ঝোপ জঙ্গলের মাঝখানে। পায়ের নিচের মাটিও যেন কেমন ভিজে ভিজে। জায়গায় জায়গায় একটু যেন পিছলও। তাছাড়া এতক্ষণ কোথাও বড় ঘাসের দেখা মেলেনি। এখন একটু দূরে দূরেই বিরাট ঘাসের ঝোপ। যে কোন জন্তুর আস্তানা থাকতে পারে তার মধ্যে।

এই সব ঘন ঝোপ জঙ্গল ভেঙ্গে এগোনোও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। তবুও মুখ বুজে কাঁটার খোঁচা খেয়েও ওরা এগোতে লাগল। বেশ কিছুটা এগোতেই কানে এল জলের শব্দ। কাছেই কোথাও যেন এক ঘেঁয়ে ভাবে প্রচণ্ড স্রোতে জল বয়ে চলেছে উৎসাহে রাজা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—নদী।

তখনি যেন মন্ত্রবলে সামনের সব ঝোপ জঙ্গল মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঢালু কাদামাটির পাড়ের সামনে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল।

সামনে দিয়ে একে বেঁকে বয়ে গেছে নদী। প্রচণ্ড জলের স্রোত তাতে। নদীর এপারে ঘন জঙ্গল ওপারেও জঙ্গল। সে জঙ্গলের শেষে মাইল কয়েক দূরে, আকাশ ছোঁওয়া লম্বা সারি পাহাড়ের দেওয়াল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যতদূর দেখা যায় পাহাড় পাহাড়। নদীর এপার ওপার কোন পারেই কোথাও মানুষের বাসের কোন চিহ্ন নেই।

—না একটু ধোঁয়া বা না একখানা ঘর। চারদিকে ছড়িয়ে শুধু গাছের ভিড়। হতাশ হল ওরা গভীর ঘন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বোকা বনে গিয়ে রাজা বলল

যাঃ আমরা যে একটা বন্দুকওয়ালার কথা ভাবছিলাম সে গেল কোথায়? এযে দেখছি শুধুই পাহাড় আর জঙ্গল। সব খাটুনি বাজে হল। যাঃ।

বিলি বলল, না তা কেন। এই যে এত সুন্দর জায়গায় আমরা আসতে পারলাম তাও কি কম। তবে হ্যাঁ যা চাইছিলাম এ তা নয়।

হামিদুল বলল—ও সব কথা যাক্। নদীর স্রোত দেখে মনে হচ্ছে এ নদী ঐ কাছের পাহাড় থেকেই বার হয়েছে। পাড় ধরে এগোলে আমরা পাহাড়ে পৌঁছাব।

—তাতে লাভ? বিলি জিজ্ঞাসা করল।

—যদি পাহাড়ে ওঠা যেত তো বুঝতে পারতাম আমরা কোথায় আছি। কাছে কোথাও কোন লোকের বাড়ি আছে কিনা।

—চল, যাবে পাহাড়ে? ব্যস্ত হয়ে রাজা বলল।

—না। বাধা দিল বিলি। মনে রেখ টম বলেছে প্লেন ছেড়ে বেশী দূরে যাওয়া চলবে না। তাছাড়া এ জঙ্গলে মানুষ না থাকলেও যে ভয়ঙ্কর সব জন্তুরা নেই তার তো কোন প্রমাণ পাইনি এখনো। আর কিছু করার নেই এখন আমাদের। চল আমরা ফিরি।

—কিন্তু একথা তো ঠিক একটা ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে পড়েছি আমরা। রাজা বলল।

হ্যাঁ তাতে কি?

---এ জঙ্গলের মধ্যে আমাদের কেউ আর খুঁজে পাবে না। এখান থেকে যেতে গেলে পথ আমাদেরই খুঁজে বার করতে হবে। আর তা করতে গেলে তো ঐ পাহাড়ে উঠতে হবে।

রাজার একথা শুনে বিলি আর হামিদুল মাথা নিচু করল। সত্যি বলতে কি এই ভীষণ জঙ্গল দেখে ওদের ও মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। ওরাও ভাবছিল এ জঙ্গলে কেউ ওদের খুঁজে পাবে কি না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হামিদুল বলল

---যদি তুমি যেতে বল বিলি আমি ঐ পাহাড়ে যাব। কারণ তার ফল হয়ত ভাল হবে, আমাদের সঙ্গের আহতরা কম কষ্ট পাবে। কিন্তু ফিরতে দেরী হলে তো সবাই ভাববে! তার থেকে চল আমরা এখুনি যাই। ফিরে গিয়ে সবার সাথে পরামর্শ করে তারপর যা হয় করব।

কথাটা মন্দ লাগল না বিলির। রাজাও বলল।

—সেই ভাল। চল তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরি।

আবার কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে ওরা ফিরতে সুরু করল। সবার আগে রাজা। মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ও গাছের গায়ে খোদাই করা পথের নিশানা দেখে নিয়ে পথ ঠিক করতে লাগল। গভীর জঙ্গলে নিশানা খুঁজতে ও যেন হিমসিম খেয়ে গেল। নিশানার দিকে চোখ রাখতে রাখতে বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে হঠাৎ খেয়াল হল বিলি আর হামিদুলের গলার আওয়াজ তো আর শোনা যাচ্ছে না। এমন কি শুকনো পাতার উপরে পায়ের শব্দও থেমেছে। ফিরে দাড়িয়ে রাজা ডাকল—হামিদুলদা। তোমরা কোথায়?

লক্ষ্য করল ওর ডাকে ডানদিকে একটু দূরের একটা ঝোপের ডালপালা গুলো হঠাৎ নড়তে আরম্ভ করল। শুকনো পাতা মাড়ানর আওয়াজও উঠল। মনে মনে ও ভাবল এ কেমন ব্যাপার। ওরা এমন লুকোচুরি খেলছে কেন! এখন কি এসব করার সময়? বেশ লোক তো ওরা!

—একি করছ তোমরা? বেশ রাগ করেই ও বলল। বলে দুপা এগিয়েই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল ওর। ঝোপের ভিতরে সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু। —একটা বিরাট গুল বাঘ! জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে তার ল্যাজের ডগা নাড়ছে।

নিজের হাতের গাছের ডালটার দিকে একবার তাকিয়ে অসহায়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল রাজা। এক সেকেণ্ড—দু সেকেণ্ড। হঠাৎ ওর কানের কাছে প্রচণ্ড শব্দে কি যেন ফেটে পড়ল। থর থর করে সারা শরীর ওর কেঁপে উঠল। কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে অবাক হয়ে দেখল ও গুল বাঘটা মাটির উপরে আস্তে লুটিয়ে পড়ল।

চট্ করে একটা কথাই মনে হল ওর—বন্দুক!! বন্দুকের আওয়াজ শুনেছে ওঁ। তবে কি সেই বন্দুক ওয়ালার দেখা পেয়েছে ও? দূরে হামিদুল আর বিলির গলা শোনা গেল। প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে ওরা। বোধ হয় ছুটছেও, ওদের চিৎকার তাই ক্রমে কাছেই আসতে লাগল।

—কোথায় তুমি রাজা? কোন দিকে?

কোন উত্তর দেবার আগেই কে যেন পিছন থেকে বলে উঠল। এই হতভাগা, নড়বে না বলছি। নড়লেই মাথার খুলি উড়িয়ে দেব তোর। হাতে অস্ত্র থাকলে ফেলে দে মাটিতে। হাত তোল মাথার উপরে। অবাক হয়ে রাজা ভাবল এই তাহলে সেই বন্দুকওয়ালা! যাকে ওরা খুঁজে মরছে।

খুঁজেও পাওয়া গিয়েছে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এ কেমন ধরনের কথা লোকটার? কেউকি এমন করে কথা বলতে পারে!

—হতভাগা কথা কানে গেল না তোর! মরবি?

এমন কুৎসিত গলার শব্দ কারও হয় নাকি! কেমন যেন ঘাবড়ে গেল রাজা। লোকটা তো ঠাট্টা করছে না। বাপ্‌রে, এ আবার কেমন লোক? ডাকাত নয়তো? ভয়ে ও আস্তে আস্তে মাথার উপরে দুহাত তুলল। ভাবল একবার চেঁচিয়ে ওদেরও সাবধান করে দেয়। কিন্তু ভয়ে গলা দিয়ে আর কোন কথা বার হলনা।

এইতো বাবা কথা কানে গিয়েছে! এখন চাঁদ আস্তে ঘুরে দাঁড়াওতো দেখি। পিছনের লোকটা কথা-গুলো বিচ্ছিরিভাবে বলে হেসে উঠল। ভয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে দাড়াল রাজা। বুক ওর তখন কাঁপছিল। ভেবেছিল একটা ভীষণ কাউকে দেখতে পাবে। আসল ডাকাত! ইয়া গোঁফ্ ইয়া দাড়ি। লাল টকটকে চোখ! হতাশ হল ও। এই লোকটা ডাকাত! এতো মনে হচ্ছে জন্ম থেকেই পেট ভরে খেতে পায় না। তাহোক, লোকটার চোখ দুটো লাল না হলেও কি বিশ্রী। তার থেকেও বিশ্রী ওর গলা। নাঃ লোকটা মোটেই ভাল নয়।

—তুই! অবাক লোকটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তুই এতটুকু পুঁচকে ছেলে এখানে কি করছিস!

গলা শুকিয়ে ততক্ষণে কাঠ হয়ে গেছে। তবুও চুপ করে থাকলে যে এমন ভয়ঙ্কর লোকের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না তা বুঝল রাজা। যা হোক বুদ্ধি করে কিছু বললে হয়ত ও ছাড়া পেতে পারে। দুবার ঢোক গিলে উত্তর দিল রাজা—আমি? আমি হারিয়ে গেছি।

—হারিয়ে গেছিস! লোকটা কেমন করে যেন ওর মুখের দিকে তাকাল। তুই এলি কোথা থেকে?

—ঝড়ে প্লেন ভেঙ্গে পড়েছে জঙ্গলে, ঐ প্লেনে আমি ছিলাম। কোন মতে কথাগুলো বলল রাজা। কপাল বেয়ে তখন ওর ঘাম ঝরছে।

খুব সাবধানে কথা বলতে হবে। মনে মনে ও নিজেকে বারবার সাবধান করতে লাগল। নইলে এ লোকটা হয়ত ভীষণ কিছু খারাপ কাজ করে বসতে পারে। বুঝে সুঝে কথার উত্তর দিতে হবে।

—তুই একাই বেঁচেছিস! না আরও কেউ আছে? ধমকে জিজ্ঞাসা করল লোকটা।

একটু থেমে ঢোক গিলে রাজা বলল—আমি আর আরও দুজন ছেলে শুধু বেঁচেছি। আর কেউ বাঁচে নি।

—লোকটা একথা শুনে হঠাৎ লাফা এগিয়ে এসে হাতের বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে ওর দু কাঁধ ধরে ভীষণ ভাবে নাড়া দিতে সুরু করল।—তুই মিথ্যা বলছিস না তো?

—না। ঝাঁকানির চোটে তখন ওর প্রাণ যাবার উপক্রম তবুও অনেক সাহস করে উত্তর দিল রাজা। এখন এ মিথ্যা কথা না বললে লোকটা যদি অন্য সবারও কিছু ক্ষতি করে। তবে! ও যে ডাকাত তাতে তো কোন সন্দেহ নেই!

—আমি কাল রাতে আওয়াজ আর আগুন দেখে তাই বুঝেছি। —যাক্ বাঁচা গেল। বলেই লোকটা ওর কাঁধের বন্দুক হাতে তুলে নিল। দু'চার পা পিছিয়ে গিয়ে বলল—তবে তুইই বা আর বেঁচে থাকিস কেন? তোকেও খতম করে দিই। তারপর দেখা পেলে তোর দু বন্ধুকেও—! প্লেনের যা কিছু সব লুট করতে হবে।—বলেই হাতের বন্দুক যেই কাঁধে তুলতে যাবে তখুনি ওর পিছন থেকে এক সাথে ওর পিঠের উপরে লাফিয়ে পড়ল বিলি

আর হামিদুল। ওদের এই আচমকা ধাক্কায় লোকটার হাতের বন্দুকে আওয়াজ হয়ে গেল। লোকটাও একটা বিশ্রী রকম আওয়াজ করে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বন্দুকটা ওর ছিটকে পড়ে গেল দূরে। এক লাফে সে বন্দুক হাতে তুলে নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বিলি বলল।

—এবারে, শয়তান? তুমি নড়লে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। —একটুও মিথ্যা বলছি না।

লোকটা যেন ওকথা শুনতেই পেল না। কপালটা ফুলে আলু হয়ে গেছে। সেখানে হাত বোলাতে বোলাতে উঠে বসল।

—নড়বে না বলছি। ধমকে উঠল হামিদুল।

—খবরদার। উল্টে লোকটাই চেঁচিয়ে উঠল। —বন্দুক দিয়ে দাও বলছি। দাও। দিলে? সত্যি লোকটা উঠেই দাঁড়াল।

হামিদুল রাজাকে ততক্ষণে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বিলির পিছন দিকে। —বলল—না বিলি দিও না বন্দুক। দিও না। দেখছ না ও শয়তান।

এসব কথা শুনে লোকটা কিন্তু একটুও রাগ করল না। মাটি থেকে টুপিটা তুলে মাথায় পরতে পরতে বলল—কিন্তু কি করবে ও বন্দুক দিয়ে তোমরা? ওটা তো খেলনা নয়। তাছাড়া ওতে গুলিও নেই। কথাগুলো বলে লোকটা দাঁত বার করে হেসে যেন সহজ হতে চেষ্টা করল। দাও, দিয়ে দাও বন্দুক। বুঝলে হে লক্ষ্মী ছেলেরা।

—না। ভীষণ চেঁচিয়ে বলল বিলি। তুমি আর এগোলে কিন্তু তোমাকে গুলি করব। শেষবার বলছি।

থমকে দাঁড়াল লোকটা। কিন্তু ওতে তো গুলি ভরা নেই!

লোকটা কথা শেষ করেছে কি করে নি হঠাৎ বিলির হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে একলাফে পাশে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল।

—গুলি আছে কিনা দেখলে? বিলি বলল। এটা যে রাইফেল তা আমি জানি।

—বেশ কি করতে চাও আমাকে নিয়ে তোমরা এখন? শান্ত গলায় লোকটা জিজ্ঞাসা করল। ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল ও।

ব্যস্ত হয়ে হামিদুল বলল—যে আমাদের বন্ধুকে খতম করতে চায় বিনা কারণে—তাকে আমরা বন্দী করব। করে নিয়ে যাব আমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে। তারপর সবাই মিলে যা করবার করব।

লোকটা অবাক হল—বলল। ক্যাপ্টেন? সবাই মিলে! তাহলে কি তোমরা ছাড়াও আরও কেউ আছে নাকি? কোথায় তারা—প্লেনে?

—সে দেখব পরে। বলল বিলি।—এখন এগোও মাথার উপরে হাত তুলে আগে আগে। যেদিকে যেতে বলব, যাবে। এগোও।

—বেশ, যো হুকুম। বলে লোকটা দুহাত তুলে ঘুরে দাঁড়াল। —কোন দিকে এগোবো?

—সোজা সামনের দিকে। হুকুম দিল রাজা।

—বেশ তাই সই। লোকটা হাঁটতে সুরু করল। —তোমরাও সঙ্গে আসছ তো?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই! উত্তর দিল বিলি।

হ্যাঁ সঙ্গেই থেকো, এ জঙ্গলে বড় বাঘের ভয়। তোমরা দুজনে দেখনি—এই এখুনি কি ভীষণ একটা বাঘ

মারলাম আমি। জিজ্ঞাসা কর না কেন তোমাদের ঐ ছোট্ট বন্ধুকে।

—হ্যাঁ সে কথা ঠিক। বলল রাজা—কিন্তু ওকথা আবার বলে তুমি কি আমাদের ভয় দেখাচ্ছ নাকি। ওতে আমরা ভয় পাব না আর।

—সে তো ভাল কথা—হেসে বলল লোকটা। —তা তোমাদের কার কি নাম—শুনি?

—কেন বলব? ধমকে উঠল রাজা।—তুমি বন্দী—তুমি চুপ করে থাকবে।

—বলবে না! বেশ।—আমার নাম গ্রাটেনকো। কি সুন্দর নাম বলতো? তবে আমি ডাকাত গ্রাটেনকো। আমাকে জ্যান্ত ধরতে পারলে সরকার তোমাদের অনেক টাকা পুরস্কার দেবে। বুঝলে খুদে সেপাইরা? হো হো করে ভীষণ ভাবে হেসে উঠল ডাকাত গ্রাটেনকো ওর নিজের রসিকতায়।

খবরদার, ঠাট্টা করবে না বলছি। আবারও ধমকে উঠল রাজা। হাসি থামিয়ে বলল গ্রাটেনকো—ঠাট্টা তোমরা বোঝ নাকি? কচু বোঝ। তোমরা এক একটি নিরেট গরু।

—চুপ। এবার ধমকে উঠল বিলি। কি হচ্ছে এসব।

—কচু, কচু, বোঝ তোমরা। নইলে বাঘের মুখ থেকে যাকে বাঁচালাম তাকে কিনা খতম করে দেব ভাবলে! বিশ্বাস করলে সে ডাকাত। লোকটা আবারও হো হো করে হেসে উঠল।—আসলে আমি তোমাদের ভয় দেখাচ্ছিলাম। এটা বুঝলে না?

কেমন যেন ঘাবড়ে গেল বিলি। বোকার মতন চাইল হামিদুলের দিকে। হামিদুলও মাথা চুলকাতে সুরু করল।

—খবরদার। ধমকে উঠল রাজা। তোমার ঐ পচা ঠাট্টা গাধাতেও বুঝতে পারবে। এখন এগোও হাত তুলে বলছি। এগোও।

লোকটা রাজাকে মুখ ভেংচে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। আর চেঁচাতে লাগল। উপকার করে ভারি লাভ হল তো আমার।

তুমি বন্দুক ছুঁড়তে জান? হামিদুলকে জিজ্ঞাসা করল বিলি চুপিচুপি।

না জানি না। ভয়ে ভয়ে খুব চাপা গলায় উত্তর দিল হামিদুল।

—তাহলে এ রাইফেল্ আমার কাছে থাক। বলল বিলি। তুমি আর রাজা একটু পিছিয়ে থাক। আমি বন্দুক ছুঁড়তে পারি বটে তবে তেমন টিপ নেই আমার হাতে।

তাহলে কি হবে? ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল রাজা। যদি লোকটা তেড়ে আসে?

—গুলি চালাব। আওয়াজেই থামবে লোকটা।

নিজের হাতের গাছের ডালটা বাগিয়ে ধরল রাজা। হামিদুল তুলল সেটা কাঁধে। তারাও সবাই তখন এগিয়ে চলল বন্দীর পিছন পিছন।

—এবারে কোন দিকে যাব? হঠাৎ সামনে থেকে ডাকাতটা জিজ্ঞাসা করল।—ডাইনে না বাঁয়ে? না যাব সোজা?—

তাড়াতাড়ি গাছের গায়ে কাটা দাগ দেখে রাজা বলল—এখনও সামনেই চল। এই কাটা চিহ্ন দেখে দেখে।—চিহ্ন যেখানে ঘুরবে তুমিও ঘুরবে।—মনে থাকে যেন।—

—বেশ। বেশ। নিজের মাথার উপরে দু হাত চাপিয়ে দিয়ে হঠাৎ লোকটা গুনগুন করে গান ধরল। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে নতুন ভাঙ্গা ডাল পালা আর গাছের গায়ের কাটা দাগ দেখে পথ ঠিক করতে লাগল।

ওরা বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে এমন সময় লোকটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়।

অনেকক্ষণ কুয়াশা কেটে গিয়েছে। চার পাশের অনেক দূর পর্যন্ত জঙ্গল এখন দেখা যাচ্ছে।—

সেই গভীর জঙ্গলের একদিকে তাকিয়ে লোকটা যেন থমকে গেল। বিলিদের দৃষ্টি এতক্ষণ ঐ ডাকাতের দিকেই ছিল। ওকে অমন করে থামতে দেখে ওরাও থমকে দাঁড়াল। ব্যাপার কি! লোকটা কি কোন চালাকি করছে নাকি? হাতের বন্দুক বাগিয়ে ধরে দাঁড়াল বিলি।—এ কি ওর চালাকি! না সত্যি কোন বিপদের ইঙ্গিত? হামিদুল যখন ওর কাঁধের উপরে হাত রাখল ততক্ষণে ও নিজেও দেখতে পেয়েছে ব্যাপারটা।—দূরে একটা বড় গাছের পাশ দিয়ে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসছে ক্যাপ্টেন, সঙ্গে টম। দূর থেকে ওরাও বোধ হয় এদের দেখতে পেয়েছে মনে হল। নইলে হঠাৎ ওরাই বা অমন করে দাঁড়িয়ে পড়বে কেন! হ্যাঁ তাই। তার পরেই ক্যাপটেন আর টম দৌড়াতে সুরু করল। তাই দেখে ব্যস্ত হয়ে রাজাও একটু এগিয়ে গেল ছুটে। তারপর চেঁচিয়ে বলল—এ পাশ দিয়ে এসো তোমরা সাবধানে।—বন্দীর কাছে যেওনা কিন্তু—।

হাঁপাতে হাঁপাতে ওরা কাছে এসে দাঁড়াল।

ওদের দুচোখ ভরা বিস্ময়।—কোনমতে দম ধরেই ক্যাপটেন বলল—তোমরা কেমন আছ সকলে আগে তাই বল। তারপর বল এ কে!—

কোন কথার কেউ কিছু জবাব দেবার আগেই চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো।

—আমি ডাকাত গ্রাটেনকো। আমার মাথার দাম তিনলাখ। ওদের কিস্সু হয় নি। দেখছ না আমিই বন্দী।—

—সত্যি তোমাদের কিছু হয় নি তো? টম জিজ্ঞাসা করল। দু দুটো গুলির আওয়াজ শুনে আমরা যা ঘাবড়ে গেছিলাম।

—না আমরা ভাল আছি। বলল বিলি—তবে হ্যাঁ আজ রাজার দিনটা খুব ভাল বলতে হবে। তিন তিনবার মরতে মরতে বেঁচে গেল ও।

—সেকি? অবাক হয়ে বলল ক্যাপটেন।

তখন বিলি ওদের—সব কথা খুলে বলল। বিলি থামতেই গ্রাটেনকো চেঁচাতে সুরু করল। সব মিথ্যা কথা। সব মিথ্যা কথা। ও যা বলছে তার সবটুকু মিথ্যা।

—তুমি কি বলতে চাও? গম্ভীর ভাবে ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করল।

—তুমি এদের ক্যাপটেন? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার কিছু বুদ্ধি আছে। আমার কথা শুনলেই তুমি সত্যি মিথ্যা বুঝতে পারবে। আমার কথাও শোনা হোক।

—বেশ বল তুমি কি বলতে চাও।

—কাল রাতে প্লেন পড়ার আওয়াজ আমি পেয়েছিলাম।—আজ সকালে তাই খুঁজতে বার হয়েছিলাম। যদি কেউ বাঁচে তাদের সাহায্য করব বলে। পথে হঠাৎ দেখি তোমাদের ঐ পুঁচকে বন্দুর সামনে দাড়িয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু গুল বাঘ। গ্রাটেনকো ছাড়া একগুলিতে তাকে খতম করত কে?—তবে হ্যাঁ তোমাদের পুঁচকে বন্দুকে আমি মিথ্যা কিছু ভয় দেখিয়ে ছিলাম মজা করব বলে। ব্যাস তাই সত্যি ভেবে পিছন থেকে ওই ওরা দুজন আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে আমাকে বন্দী করেছে। তুমিই বলত—আমার যদি বদ মতলব থাকবে তবে আমি কেন ওকে বাঘের হাত থেকে বাঁচাব।—এখন আমার বন্দুক আমাকে ফেরত দেওয়া হোক। এ জঙ্গলে আর কিছু না থাক বাঘের উপদ্রব খুব বেশী যে—আর তোমার ঐ ওর হাতের যা টিপ বাঘ এলে উনি টিপ করে সত্যি মানুষই খুন

করবেন আগে।—

ওর কথা শুনে ভীষণ ভাবনায় পড়ল ক্যাপটেন। লোকটা কে? এলো কোথা থেকে? যা বলছে তার কতটুকুই বা সত্যি!

কোন কথাই জানে না রাণা! তবে এও ঠিক—ওকে ওরা যখন বন্দী করেছে তখন লোকটা যে বদ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এদেশ এ জঙ্গল সম্বন্ধে কোন কিছুই জানে না ও জানেনা লোকটারই বা কি মতলব। একে নিয়ে এখন কি করা যায়! সবার মুখের দিকে এক এক করে তাকিয়ে দেখল ও। না—এ বিষয়ে কারও কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য পাওয়া যাবে না। সবারই বুদ্ধি যেন কেমন জট পাকিয়ে গেছে।—যা করতে হবে তা নিজেকেই করতে হবে।—বিলি যা বলেছে—সে সব কথার পর লোকটাকে এতটুকুও বিশ্বাস করা বোধ হয় ঠিক হবে না।

স্পষ্ট করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলল—দেখ। তোমাকে যখন আমরা ভাল করে চিনি না। আর যখন তুমি নিজেই বলেছো আমাদের সবাইকে মেরে ফেলে প্লেনটা লুট করবে—তখন তোমার বন্দুক আমি তোমাকে ফেরত দেব না তবে তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে তুমি আমাদের বন্ধুকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়েছো।—আমরা তোমার সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করব না—যদি তুমি নিজে তা না কর!

ক্যাপ্টেনের উত্তর শুনে গ্রাটেনকো বিশ্রীভাবে গর্জন করে উঠল।

রাজা বলল—তুমি ভাল লোক তো অমন বিশ্রীভাবে চেঁচাচ্ছ কেন। অমন করে কি মানুষে চেঁচাতে পারে?

—খুদে শয়তানের দল—দাঁত খিঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো—আমার বন্দুক আমাকে দেবেন না। এ্যাঃ—এক এক ঘুঁসিতে সবকটার মুণ্ডু আমি ঘুরিয়ে দেব তবেই বুঝবেন বাছাধনেরা কার সাথে লাগতে এসেছেন।

—খবরদার। চেঁচিয়ে উঠল বিলি।—মনে রেখ তোমার রাইফেলে এখনও তিনটে গুলি ভরা আছে। আর আমার টিপ যত খারাপ ভাবছ তত খারাপ নাও হতে পারে। তার থেকে মেনে নাও না ক্যাপ্টেনের কথাটা। তুমিও কিছু করবে না—আমরাও কিছু বলব না।—আমরা তো এখানে চিরকাল থাকতে আসিনি। যাব যখন—তোমরা রাইফেল ফেরত দেব।

চেঁচানো থামাল গ্রাটেনকো। ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল—ফিরে যাবে তোমরা? কেমন করে?

—বাঃ—আমাদের খুঁজতে লোক আসবে না? তারা এলেই তো আমরা ফিরে যাব।

—লোক আসবে—কোথা থেকে?—ব্যস্ত হয়ে গ্রাটেনকো আবারও জিজ্ঞাসা করল।

—কেন টাণ্টামোরা থেকে। আমরা সবাই তো টাণ্টামোরা রিপাবলিকের অতিথি। যাচ্ছি সেখানে স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে।

—সর্বনাশ। চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। আমার মাথায় নিশ্চয়ই গোবর পোরা। সারারাত এই সহজ কথাটাকে ভাবিনি। সর্বনাশ! সর্বনাশ!!

টম্ কারপেণ্টার এতক্ষণ চুপ করে ছিল এখন বলল—কেন তাতে তোমার ক্ষতি কিসে?

—সে তুমি বুঝবে না। যাক্। একটা কথা বলব—আমার রাইফেলটা দিয়ে দাও আমি এ তল্লাট ছেড়ে চলে যাব কথা দিচ্ছি। আর তোমাদের বিরক্ত করব না। দেবে? দাও।

—না। স্পষ্ট করে বলল—টম। তুমি এখন আমাদের সাথে যাবে প্লেনের কাছে। আমাদের খোঁজ করতে যারা আসবে—তারা এলে তবে তোমার রাইফেল ফেরত পাবে। ততক্ষণ তুমি বন্দী।

—বন্দী? চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। বলে কি!! কালকের এক পুঁচ্‌কে ছোঁড়া। গ্রাটেনকো বন্দী! অমন যে অমন শক্ত প্রেসিডেন্ট ব্রোকেনসিল সেও পারলো না আমাকে বন্দী করতে আর তাই করবে কিনা এই পুঁচ্‌কে ছোঁড়াগুলো।···চেঁচানো থামল ওর বিলির হাতের বন্দুকটার দিকে হঠাৎ নজর পড়াতে—আচ্ছা আমিও দেখে নেব। আমিও ছাড়ব না। মওকা আমিও পাব।···বলে ও চুপ করল।

ক্যাপ্টেন হুকুম করল—চল এগোনো যাক—প্লেনে সবাই নিশ্চয়ই খুব ভাবছে এতক্ষণ।

ওরা সবাই আবার হাঁটতে সুরু করল। সবার আগে গ্রাটেনকো। তার দুহাত মাথার উপরে। তার ঠিক কিছু পিছনেই রাজা। ও মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে ওর পথের নিশানাগুলো দেখছে। তার পর বিলি—তার হাতে রাইফেল। বাদ বাকিরা তারপর।

কুয়াশাও ততক্ষণে একেবারে কেটে গিয়েছে।—তবে মাথার উপরে আকাশ ছোঁওয়া গাছের জট থাকাতে আকাশ আর ওরা দেখতে পারছে না। মাঝে মাঝে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোর ঝিলিক আসছে।

চলছে ওরা। কারও মুখে কোন কথা নেই। সবাই ভাবছে বোধ হয় গ্রাটেনকোর কথা।—নিজেদের এই বিপদের উপরে এ আবার কি ঝঞ্ঝাট। সারাক্ষণ ওকে পাহারা দেওয়াও তো কম কথা নয়।

রাতের বৃষ্টিতে জমির উপরের ঝরা পাতার গাদা ভিজে জ্যাব জ্যাবে হয়ে রয়েছে।—প্যাচ প্যাচেও জায়গায় জায়গায়। জোরে চলতে চেষ্টা করেও চলতে পারছে না ওরা।—একঘেঁয়ে চলার শব্দই সুধু উঠছে। থেকে থেকে রাজা শুধু গম্ভীর ভাবে হাঁকছে।

—এবারে ডাইনে···। এবারে বাঁয়ে। ঐ বড়গাছটার পাশ দিয়ে।—এখন সোজা—তাই শুনেই সবাই চলছে।

একবার হঠাৎ ওর ডাকের মাঝখানে গ্রাটেনকো চেঁচিয়ে উঠল—এই ও। চুপ।

ওর ঐ পিলে চমকানো চিৎকারে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যাপার কি!

গ্রাটেনকো কানের পিছনে দু হাত রেখে তন্ময় হয়ে কি যেন শুনতে লাগল।—একবার এপাশ ফিরল আর একবার ওপাশ—শেষকালে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে রইল। ততক্ষণে টম-এর কানেও আওয়াজটা ধরা পড়ল।—কোন সন্দেহ নেই—দূরে আকাশ দিয়ে উড়ে আসছে অন্তত কম করে গোটা দুই প্লেন বা হেলিকপ্টার। একটু মন দিয়ে শব্দটা শুনল ও। তারপর ক্যাপ্টেনের কাঁধের উপরে হাত রেখে বলল—শুনতে পাচ্ছ ক্যাপ্টেন?

—হ্যাঁ পাচ্ছি। আস্তে উত্তর দিল ক্যাপ্টেন রাণা।

—ওরা এসে গিয়েছে।

—হ্যাঁ তাইতো মনে হচ্ছে।

—এখন আমাদের তাড়াতাড়ি ফেরা উচিত প্লেনের কাছে।

শব্দ ততক্ষণে বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।—আওয়াজ কানে যেতেই—রাজা লাফিয়ে উঠল।

—প্লেন—প্লেন। ক্যাপ্টেনদা—প্লেন। নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজতে এসেছে।

—হ্যাঁ—কিন্তু এ ভীষণ জঙ্গলে কি করে আমাদের খুঁজে পাবে।—হতাশভাবে বলল হামিদুল।

—আমি কি বন্দুকের আওয়াজ করব। ওরা শুনতে পাবে।—ব্যস্ত হয়ে বিলি বলল।

—মন্দ কথা নয়।—টম বলল—। কিন্তু এখন নয়। এখন চল তাড়াতাড়ি প্লেনের অন্য সবার কাছে। শব্দ

কাছে এলে তবে আওয়াজ করবে।

—আমরা আর কতদূরে আছি?—রাণা জিজ্ঞাসা করল।—আমরা পথ হারাইনি তো?—

—না।—কখনই না।—বলল রাজা।—আমরা এসেও গিয়েছি বলে মনে হচ্ছে।

—তবে চল, তাড়াতাড়ি চল। হুকুম দিল রাণা চলতে সুরু করেই—থমকে দাঁড়াল সকলে কি সর্বনাশ—সেই লোকটা কই? ডাকাত গ্রাটেনকো!

—বন্দী পালিয়েছে। হতাশ ভাবে বলল বিলি।

—যাক গে। তার চিন্তা আমাদের নয়। বলল টম।

—তাহলে এসো আমরা ছুটতে সুরু করি। শব্দ তো প্রায় কাছে এসে গেল। বলল রাণা।

—হ্যাঁ তাই কর। বলল হামিদুল।

ওরা ছুটতে সুরু করল। জঙ্গল জঙ্গল—কোথাও এতটুকু ফাঁকা নেই। কোথাও আকাশ দেখা যাচ্ছে না। কি হবে তাহলে। সবার মনে ঐ এক চিন্তা।—এক সময়ে মনে হল শব্দ যেন ঠিক মাথার উপরে এসে গিয়েছে।

—থাম।—বলল টম।—বিলি ফায়ার কর। শিগ্‌গির।—শিগ্‌গির।

একটা গাছের গুঁড়ির দিকে লক্ষ্য করে বিলি ফায়ার করল—দুম, দুম,

এবারে? এবারে কি হবে? এ শব্দ কি ওরা শুনতে পেয়েছে?—আওয়াজটা একঘেঁয়ে ভাবে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর একসময়ে ওদের ঠিক মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল অন্য দিকে।—ক্রমে শব্দ যেন কমে আসতে লাগল।—শুনতে পায়নি ওরা। কাঁদ কাঁদ ভাবে বলল হামিদুল।

—এই যে এখানে আমরা। এখানে—শুনতে পাচ্ছ না? এই যে এখানে।—হঠাৎ আওয়াজের পিছনে ছুটতে ছুটতে চেঁচাতে লাগল রাজা।—চলে যেও না তোমরা। যেও না, যেও না বলছি।

—আর গুলি আছে? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল টম।

—হ্যাঁ আছে।—বলল বিলি—

—তবে ফায়ার কর।—ওর কথা শেষ হবার আগেই আওয়াজ হল—দুম।—কিন্তু তবুও শব্দ যেন—দূরেই সরে যেতে লাগল।—

—শুনতেই পায় নি ওরা।—হতাশভাবে আবার বলল—হামিদুল।—তাহলে কি হবে?

মুহূর্তে নিজেকে শক্ত করল রাণা। না এখন ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। মন খারাপ করার সময় এখন নয়। বলল, মিথ্যা ভাবছ হামিদুল। দেখো ওরা আবার ফিরবে। রাজা, দেখ তো পথ হারালাম নাকি? চল এগোই আমরা। মনে রেখ ওখানে বড়রা কেউ নেই! আমাদের তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।

টম বলল—ঐ শয়তানটার কথাও ভুললে চলবে না। ও যদি আগে প্লেনের কাছে গিয়ে পৌঁছায় তো ভীষণ বিপদ হবে।

বিলি বলল—আর আমার রাইফেলের গুলিও খতম। ও ফিরলে ওকে ঠেকান যাবে না আর কিন্তু।

তার আগে কি ওরা আসবে না? হামিদুল আকাশের দিকে হাত তুলে দেখাল। ওরা নিশ্চয়ই ফিরবে এখুনি।

রাজা পথের নিশানা ঠিকই দিয়েছিল। আর অল্প এগিয়ে একটা ঢিপি পার হতেই সামনে ওরা দেখতে পেল প্লেনের ধ্বংস স্তূপ। দেখল ওরা রুক্মিনী আর শকুন্তলা বাইরে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে। ওরা কাছে আসতেই দুজনে এক সাথে চেঁচিয়ে উঠল—

—প্লেন প্লেন। প্লেনের শব্দ শুনতে পেয়েছো তোমরা।

—শোন শব্দ আবার ফিরে আসছে।

প্লেনগুলো কি ফিরে আসছে !!

সবাই আবার থমকে দাঁড়াল। হ্যাঁ কোন সন্দেহ নেই।

শব্দ আবার ফিরেই আসছে। কাছে। কাছে। আরও কাছে।

শেষ পর্যন্ত শব্দটা যেন মাথার উপরে এসে ঘুরে ঘুরে পাক খেতে লাগল। তারপরেই একটু দূরের গাছ-পালার উঁচু ডালপালায় যেন কেমন একটা শব্দ উঠল। মড় মড় করে কিছু ছোট ডালপালাও ভাঙ্গল। সপাং করে আওয়াজ হলে দড়ির মাথায় কি যেন সেখানে ঝুলতে লাগল।

প্যারাস্যুটে করে জিনিস ফেলেছে। চেঁচিয়ে উঠল টম।

ঝপাং-ঝপাং-আরও পরপর কয়েকটা আওয়াজ উঠল। তার পরেই মাথার উপরের শব্দ আবার ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল।

—এসো আমার সাথে। ডাকল টম। কিন্তু সে ডাক শোনাব জন্য কেউই ওখানে ততক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল না।

রুক্মিণী আর শকুন্তলা ওদের সবাইকে অমন করে ছুটে যেতে দেখে অবাক হল। প্লেনগুলো যে কিছু ফেলে গিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কি ওগুলো খুবই দরকারি জিনিস? তবে কি বাইরের পৃথিবীর লোকেরা জানে যে এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে ওরা এখনও বেঁচে আছে। একথা ভাবতেই মনটা খুব খুশিতে ভরে উঠল রুক্মিণীর। তবে আর ভাবনা কেন—আজ নয়তো কাল ঠিক লোকজন আসবে ওদের উদ্ধার করতে। তবে ভাবনা একটু আছে বই কি। তিন তিন জন আহত আছে সঙ্গে। সময় ওদের ক্ষতি করতে পারে।

শকুন্তলা বলল—অতগুলো বন্দুকের আওয়াজ শুনে তো আমি ভয়ে মরি। ভাবলাম বাঘ না ভাল্লুক কিসের মুখে পড়েছে ওরা—যাক্ সবাই ভাল আছে তাহলে।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তার উপরে প্লেনগুলোও কি যে ফেলে গিয়েছে সেখানে। নিশ্চয়ই ওষুধ পত্র খাবার দাবার। রুক্মিণী বলল।

—চলো বসে না থেকে তাহলে আমরাও গিয়ে ওদের সাহায্য করি! তাতে কাজ তাড়াতাড়ি হবে।

—সেই ভাল।

ওরা দুজনে গাছের ডাল বেয়ে ঢুকল ভিতরে। মুংলি তখন একটা বিলিতি ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে গুরুদিৎকে হাওয়া করছিল। ওদের দুজনকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইলো।

—সব খবরই ভাল। বলল শকুন্তলা। সবাই ভাল আছে। বন্দুকের আওয়াজ যে কেন হল তা বুঝলাম না। তবে সবাই ভাল আছে। আর প্লেন এসে প্যারাস্যুটে করে অনেক কিছু জিনিস ফেলে গেছে। আমরা যাব ওদের জিনিষ নাবাতে সাহায্য করতে?

লিজা, প্রিয়া আর শান্তা যাবে না। গম্ভীর ভাবে বলল মুংলি—ওরা খুব ছোট। আর কুণাল তোমারও কাজ আছে অনেক এখানে।

—নিশ্চয়ই, বলল কুণাল। সবাই গেলে চলবে কেন?

বেশ তবে তোমরা দুজনে যাও। দেখ আগে কোন ওষুধের বাক্স পাও কিনা। পেলেই তা নিয়ে ফিরে

আসবে কিন্তু তোমরা। মনে থাকে যেন।

—আচ্ছা। বলে ওরা দুজনে ব্যস্ত হয়ে গাছের ডাল বেয়ে লাফিয়ে নাবল। ওরা চলে যেতেই একটা ভাঙ্গা সিটের আড়াল থেকে উঠে এল লিজা গোমেজ, প্রিয় রায় আর শান্তা বড়দোলুই। মুংলির কঠিন শাসনে এতক্ষণ ওরা ওখানে শুয়ে বিশ্রাম করছিল! ওদের মধ্যে সব থেকে ছোট লিজা বলল। আমরা এখন কি করব মুংলি দিদি? আমরা তো অনেক বিশ্রাম করেছি।

শান্তা বলল—হ্যাঁ, আমরাও কাজ করব দিদি। আমরাও বড় হয়েছি। অনেক কাজ করব।

প্রিয়া ও শান্তা—বলল। ডাক্তার দিদি তোমার হাত ব্যথা করছে। আমি হাওয়া করব, দাও।

—বেশ, তোমরা তাহলে এখানে এসে বস, লিজা তুমি যাও তমুক্কা দিদির কাছে বসে গল্প কর। সেই তোমার কাজ। প্রিয়া তুমি যাও রাধারানীর কাছে। শান্তা তুমি যাও আমিনার কাছে। ও খুব ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। ওকে গল্প বলে ভুলিয়ে রাখ গিয়ে।

—সেই ভাল। সেই ভাল। ওরা হৈ হৈ করে যে যার জায়গায় গিয়ে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা জায়গাটা কথায় আর হাসিতে ভরে উঠল। এমন কি আমিনা যে এতক্ষণ ব্যথায় ছটফট করছিল, ব্যথা ভুলে হাসতে লাগল।

—কুণাল—ডাকল মুংলি—

—কি বল। এগিয়ে এল কুণাল।

—তুমি একটু বোস তো গুরুদিতের কাছে। আমি একবার নিচে নামবো। দেখবে সত্যি কোন ওষুধ পত্র পেয়েছে কিনা ওরা। একটা মলম চাই নইলে আমিনার কাটা ঘাগুলো পাকতে পারে।

—বেশ আমি বসছি। তুমি যাও।

মুংলি উঠল। এমার্জেন্সি দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেই অমনি হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকল একটা ভীষণ দেখতে লোক। দুচোখ তার লাল। সমস্ত মুখে কি ভীষণ একটা রাগের ভাব। হাতেও লোকটার একটা অস্ত্র। বোধ হয় স্টেনগান হবে।

ভয় পেয়ে মুংলি বলল—কে তুমি?

লোকটা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—এবারে!

—কি চাও তুমি এখানে? কাঁপা গলায় মুংলি জিজ্ঞাসা করল।

—সেই খুদে শয়তান গুলো কোথায়? কোথায় তারা? গর্জন করে উঠল লোকটা। গ্রাটেনকোকে বন্দী করার মজা এবারে বাছাধনদের বুঝিয়ে দেব। কোথায় তারা?

—কাদের কথা বলছ তুমি?

—এই—ও। ধমকে উঠল গ্রাটেনকো—ন্যাকা সাজছিস? জানিসনা কাকে খুঁজছি? ক্যাপ্টেন। তোদের ক্যাপ্টেন। আর তার দলবল। কোথায় তারা?

—বাইরে গেছে।...

—জাহান্নমে পাঠাবো তাদের। —হা হা হা। বিভৎস ভাবে হাসতে লাগল।—আমি বন্দী.....বলে কিনা আমি বন্দী। এবারে কে কাকে বন্দী করে দেখিয়ে দেব।

—কি বলছ তুমি? আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনা না! ভয়ে ভয়ে মুংলি বলল।

—চোপরাও। কাউকে কিছু বুঝতে হবে না। এখন বল—তোরা দলে সব সুদ্ধ কজন আছিস। বল শিগগির।

—আমরাতো পনের জন আর তনুক্কা দিদি। মোট ষোল জন। একটু সাহস করে মুংলি উত্তর দিল।

—বাপরে ষোল জন। এ যে একপাল ভেড়া।·····বেশ তাই সই। সব কটাকেই আমি বন্দী করবো। সব কটাকে।·····হাঃ হাঃ হাঃ গ্রাটেনকো এবারে ভেড়ার পাল চরাবে মাজিনকোর জঙ্গলে হাঃ হাঃ হাঃ।

—আমাদের তুমি বন্দী করবে? অবাক হয়ে মুংলি জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু কেন? আর তুমিই বা কে? আমি কিন্তু সত্যি কিছুই বুঝতে পারছিনা।

—বুঝিয়ে দিচ্ছি এখুনি। যা চুপ করে গিয়ে ঐ কোণে বসে থাক। নড়বিতো কুকুরের মতন গুলি করব। আমার নাম গ্রাটেনকো। আমার মাথার দাম তিন লাখ। হাঃ হাঃ হাঃ! কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ব্রোকেনসিল কি জানে এই ষোলটি বিদেশীর মোট দাম কত? খুব বেশী না হলেও একটা গ্রাটেনকোর পক্ষে অনেক অনেক অনেক। যা যা—গেলি, গিয়ে বসলি ঐ কোণে? গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে ও থামল।

লোকটার যা ভয়ানক কথাবার্তা। সাহস হল না মুংলির ওর কথা উড়িয়ে দেবার। তাড়াতাড়ি চুপ করে বসল এক কোণে। কি চায় লোকটা! ক্যাপ্টেনকেই বা জানল কেমন করে। আর বন্দী করার কথা মানে কি তার, নাঃ লোকটাকেতো মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না। ওর কোন কথা তো ভাল করে বোঝাই যাচ্ছে না কিন্তু কি করা উচিত এখন···একা বসে বসে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারল না মুংলি। তাকিয়ে দেখল লোকটাও যেন কি ভাবছে মাথা নিচু করে। হাতের গানটার মুখও নিচু করা। দু তিন মিনিট এমনি করেই কেটে গেল তারপর নিজের সমস্ত শরীরটাকে একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে যেন আবার জেগে উঠল লোকটা। এই। কেউ নড়বিনা। কেউনা। বলে নিজেই এগিয়ে এল ভিতরের দিকে যেখানে অন্য সকলে বসে আছে। ভয়ে অন্য সকলের মুখের কথাতো আগেই বন্ধ হয়েছিল এ চিৎকারে সবার মুখ ফ্যাকাসেও হয়ে গেল।

তনুক্কা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল লোকের দিকে। লোকটা কিন্তু এসব ভ্রূক্ষেপ না করেই এসে থামল কুণালের কাছে।

—তুই? তুই কি করছিস্ এখানে? কি করছিস?

—এদের দেখা শোনা করছি। ঢোল গিলে উত্তর দিল কুণাল।—এটাই এখন আমার ডিউটি।—

—এরা সব কটা শুয়ে কেন?

—এরা আহত।—একসিডেণ্টে এদের চোট লেগেছে।

—অত কথা বুঝি না।—বল—এরা হাঁটতে পারবে তো? না যদি পারে তবে ভাল হবে না বলছি।—

—না, বোধ হয় এরা হাঁটতে পারবে না। ভয়ে ভয়ে কুণাল বলল।

—আঃ, তাহলে সেই আমাকে হাত নোংরাই করতে হবে। ছুঁচো মেরে হাত নোংরা। বেশ তাই করব আমি। দরকার পড়লে তাই করব। ঐ কটার জন্য তো আমি আর ধরা পড়তে পারব না।

ওর কথা শেষ হবার আগেই বাইরে অনেকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বেশ আনন্দে কথা বলতে বলতে আসছে ওরা। ওদের সে কথা শুনেই চাপা গলায় গর্জে উঠল গ্রাটেনকো চুপ, সবাই চুপ। কেউ কোন রকম কথা বলেছিস তো শেষ করে ফেলব।

কথা বলার মত সাহস অবশ্য কারও ছিল না। দরজার ঠিক পাশে গিয়ে প্লেনের ভাঙ্গা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল গ্রাটেনকো হাতের স্টেনগানটা বাগিয়ে। দরজা দিয়ে প্রথমেই ঢুকল হামিদুল; পিঠে এক বিরাট

বোঝা নিয়ে। কোন মতে সে বোঝা বয়ে ও উঠে এলো উপরে। তার পরেই ঢুকল রাজা। তারপর বিলি আর টম। সবার শেষে রাণা। ওরা যখন ওদের পিঠের বোঝা নাবিয়ে তা গুছিয়ে রাখতেই ব্যস্ত। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল—শকুন্তলা আর রুক্মিনী। ঢুকেই দেখল সকলেই যেন কেমন চুপ করে বসে আছে। নজরে পড়ল মুংলিও তার নিজের জায়গায় বসে নেই। ব্যাপার কি! ব্যস্ত হয়ে রুক্মিনী জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে মুংলি?—তোমরা এমন করে বসে আছ যে? জিজ্ঞাসা করল শকুন্তলা। হাতের জিনিস থেকে মুখ তুলে রাণা বলল, হয়েছে কি? সবাই ভাল তো?

—না ভাল নয়। মুংলি কোন জবাব দেবার আগেই চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো এবারে! হাতের স্টেনগানটা ও তুলে ধরে আবার সেই বীভৎস হাসি হাসল। এ অস্ত্রটাও যে আমার কাছে থাকতে পারে ভাবিস নি তো! জানবি কেমন করে। পথে বার হলে এদুটো অস্ত্রই আমি সব সময়ে সঙ্গে রাখি বিপদের ভয়ে।

সবাই স্তম্ভিত। অনেকক্ষণ কারও মুখে কোন কথাই যোগালো না। তারপর সবাইকে আড়াল করে সামনে এগিয়ে এলো রাণা।—কি চাও তুমি?

—আমার বন্দুক ফেরত দে আগে। দে বলছি।

খালি রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বিলি ওর পায়ের কাছে।

—কেন তুমি এমন করছ আমাদের সাথে? শান্তভাবে রাণা জিজ্ঞাসা করল।

—বেশ করছি। গর্জন করে উঠল গ্রাটেনকো। আমি শুধু আমার ভালই বুঝি। আমার ভালর জন্য আমি যা খুশি তাই করব।

বন্দুকটার দিকে ও ফিরেও তাকাল না।

—তা কর। কিন্তু—আমাদের কষ্ট দিচ্ছ কেন?—কেন তুমি আমাদের ক্ষতি করবে বলেছিলে। তুমি আমাদের কিছু কর না আমরাও তোমার কিছু করব না, তবেই আর কোন গোলমাল থাকবে না।

—ও হো হো হো হো। হেসে গড়িয়ে পড়ল গ্রাটেনকো এই বুদ্ধি নিয়ে তুই ওদের ক্যাপ্টেন হয়েছিস। তবে তো তোরা সবাই এ জঙ্গলে বাঘের পেটেই যাবি। তার থেকে শোন আমি তোদের বন্দী করে রাখব টিবল্লির মরা খাদের গুহায়। এ পৃথিবীতে কেউ সে গুহার কথা জানে না আমি ছাড়া। বাস তারপরে দেখব কি করে প্রেসিডেণ্ট ব্রোকেনসিল আমার মাথার দাম ধরে তিন লাখ। তোদের ছাড়ব যদি আমি ছাড়া পাই।

ওর একথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রাণা। তারপর বলল—তুমি কে? কেন তোমার মাথার দাম তিন লাখ?

—সে কথাটাও জানিস না। ও হো, তা তোরা জানবি কেমন করে—তোরা যে বিদেশী। আমি গ্রাটেনকো ছিলাম কারখানার কুলি। কোন গোলমালে নেই। সারাদিন কাজ করি। বিকালে বাড়ি ফিরে মা মরা বাচ্চাটার সাথে খেলা করি। এমন সময় লাগল যুদ্ধ। টাণ্টামোরার সাথে পুব উত্তরের রাজ্য গ্রেসাকের। সবাই কত বড় বড় কথা বলতে লাগল—দেশের জন্য প্রাণ দাও। মজা, কিন্তু তারা কেউ যুদ্ধে গেল না। ডাক পড়ল আমার! আমি বললাম—যাব। কিন্তু আমার মা মরা বাচ্চাটার কি হবে? কে দেখবে ওকে। সবাই বলল—আইন—আইন! ও সব কথা আইন ভাবে না। বাচ্চাটাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলাম। ধরা পড়লাম। আমার বুক থেকে বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে পাঠান হল যুদ্ধে।

গ্রেসাবোর সাথে যুদ্ধ কেন জান! পিটকিরা মরুভূমির দখল পাবার জন্য! এক দানাও শস্য হয় না সেখানে।

জল নেই কোথাও। লোকও থাকে না। আবার পালালাম যুদ্ধ থেকে। টাণ্টামোরায় ফিরে শুনি বাচ্চাটা মরে গেছে। গেলাম বন্ধু কিফুর কাছে সাহায্যের খোঁজে। সে কাজ করে পুলিসে। সে মুখে খুব ভাল কথা বললো কিন্তু রাতের অন্ধকারে দলবল নিয়ে সে ফিরে এল আমাকে ধরতে। মানুষ মারা পেশা আমার নয়। আমি কুলি। কিন্তু সেদিন মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। একটা গুলি—ব্যাস কিফু ঘুরে পড়ে গেল। আর সেই থেকে এই মাজিনকোর ঘোর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। আমি ডাকাত গ্রাটেনকো—শয়তান মনুষ্য—আমার মাথার দাম তিন লাখ।

ওর এ গল্প শুনে সবাই চুপ। নাঃ—লোকটাকে যত খারাপ ভাবা গেছিল হয়ত লোকটা ততটা নয়। কেন সবাই ওর সাথেই বা অমন ব্যবহার করল! ও কারখানার কাজ নিয়ে থাকলেই তো সব দিক থেকে ভাল হত। ওর বাচ্চাটাও মরত না। ও এমন ডাকাতও হত না।

—সত্যি দুঃখ হয় তোমার কথা শুনে। বলল রাণা। কিন্তু ভাই আমাদের সাথেই বা তুমি কেন এমন ব্যবহার করছ? আমরা তো সত্যি তোমার কোন ক্ষতি করি নি।

—ভাই! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো—কে বলল ভাই! চোপরাও। আমার কোন ভাই নেই কোথাও। আর দুঃখু টুঃখু ওসব আমার অনেকদিন আগে হত, যখন মানুষ ছিলাম। ডাকাত গ্রাটেনকোর ওসব নেই।

—তবুও একটা কথা শোন—ব্যস্ত হয়ে কি যেন বলতে গেল রাণা।...

—না। আর কোন কথা নয়। হাতের স্টেন গানটা বাগিয়ে ধরল গ্রাটেনকো। বাজে কথায় অনেক দেরী হয়েছে। এখন সবাইকে এক এক করে যেতে হবে আমার সাথে টিবলির মরা খাদের গুহায়। সেখানে তোদের আমি বন্দী করে রাখব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাকে ওরা ছাড়ে।

—কিন্তু ওরা যে কেউ হাঁটতে পারবে না।...

—তাহলে এখানেই আমি ওদের গুলি করে খতম করে দেব। হাঁটতে হবে সবাইকে যে প্রাণে বাঁচতে চায়। দয়া মায়া ওসব গ্রাটেনকোর নেই।

—কিন্তু ও তিনজন কিছুতেই হাঁটতে পারবে না। অসম্ভব। খুব জোর দিয়ে এসব কথা বলল রাণা। ধাঁই করে গানের কুঁদো দিয়ে রাণার মুখে এক গুঁতো লাগাল গ্রাটেনকো। তবে মরতে হবে।

গল গল করে মুখ দিয়ে রক্ত বার হয়ে এল রাণার। তবুও এক পাও পিছাল না ও। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল। তবে আমাদের সবাইকে মারতে হবে তোমাকে। আমরা কেউ পায়ে হেঁটে যাব না.

—কি!! চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। শয়তান। শয়তান। সব কটা শয়তান। গ্রাটেনকোকে চেনে না। আগুন নিয়ে খেলা করছে।

সামনে এগিয়ে এল টম। মারো গুলি। আমরা তৈরী! দেরী করছ কেন?

ওকে আড়াল করে এগিয়ে এল হামিদুল। আর আমার ভয় করছে না। আমাকে আগে না মেরে তুমি কাউকেই মারতে পারবে না।

—উঃ উঃ। এক হাত দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে চেষ্টা করল গ্রাটেনকো। সব কটাকেই মারব আমি। সব কটাকেই। খুদে শয়তানের দল। আমি এক দুই তিন গুনব তার পরেও যদি তোরা না উঠিস তো আমি ঠিক গুলি করব। তোদের দিয়ে আমার যদি কোন কাজই না হয় তো তোদের আমি মারব। এক দুই—

সবারই বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। ওর চোখে মুখে যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই

যে ও এখুনি গুলি করবে। বিলি বুঝল ওদের সবাইকে ও বন্দী করে একটা ভীষণ বাজী লাগাতে চায়। তা যদি ও না করতে পারে তবে ও কাউকে এতটুকুও দয়া দেখাবে না। বাঁচার বুদ্ধি আগে করতে হবে। তার পরে নয় পালাবার পথ খুঁজে নিতে হবে।

—একটা কথা বলব? খুব শান্ত গলায় বিলি জিজ্ঞাসা করল। শুনবে আমার কথা?

—কি কথা শুনি? চেঁচালো গ্রাটেনকে। মাথার চুল ছেঁড়া বন্ধ হল ওর। দেরী করবি না। দেরী করলে আমার মাথার ঠিক থাকবে না।

—আমাদের কি সত্যি তুমি বন্দী করবে?

—নয়ত কি আমি তোদের সাথে ইয়াকি করছি! তোদের বন্দী করে আমি ছাড়া পাব!

—তাহলে নয় আমরা স্ট্রেচারে করে ওদের সবাইকে বয়ে নিয়ে যাব। তাতে সবাই যেতে পারবে। আর তোমাকেও গুলি চালাতে হবে না।

ওর কথা শুনে রাণা অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে। একি বলছো বিলি; ওকি ভয় পেয়েছে নাকি! ভাল করে ওর দিকে তাকিয়ে মনে হল! না ওর মুখে চোখে তো তার ছাপ নেই। খুব ভেবেই এসব কথা বিলি। তার নিশ্চয় কোন মতলব আছে ওরা এখন ওকে বাধা দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। লোকটা যে হঠাৎ কি করে বসবে তারও তো কোন ঠিক নেই। মিথ্যা সে ঝুঁকি নিয়ে লাভ? সময় পেলে ভেবে পরে সব কিছু করা যাবে।

বিলির কথা শুনে গ্রাটেনকো চুপ করে রইল কিছুক্ষণ তারপর বলল—স্ট্রেচার? সে আবার কি?

—একটু সময় আমাদের দাও আমরা গাছের ডাল ভেঙ্গে তা এখুনি বানাচ্ছি। ততক্ষণ না হয় প্যাকেটগুলো খুলে দেখা যাক কি কি জিনিস দিয়েছে।

আমাকে ধোঁকা দেওয়া! পালাবার মতলব করা হচ্ছে?

গ্রাটেনকোর কথা শেষ হবার আগেই চেঁচিয়ে উঠিল বিলি।

—বোকার মতন কথা বলনা। সবাই আমরা এক সাথে মরতে পারব। কিন্তু কেউ কাউকে ফেলে কোন দিনও পালাতে পারব না।

তোমার মতন মোটা মাথার হোকই সুধু ওকথা ভাবতে পারে। খবরদার। এবারে চেঁচাল গ্রাটেনকো। আমার মাথা মোটা! আমি সব বুঝতে পারি। শুধু ঠাট্টা করছিলাম। বলেই হো হো করে হেসে উঠিল।

—বাবা তোরা সবাই গিয়ে ইসটেচার বানা। আচ্ছা সাহস বটে তোদের। বাবা। বলে কিনা গ্রাটেনকোর মাথা মোটা। খুব বেঁচে গেলি আজ।

—ধন্যবাদ। বলল বিলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তুমি বাপু নিজেকে যতই শয়তান বল আসলে তুমি অতটা নয়।

—ভাগ। ভাগ্ এখান থেকে।

—ক্যাপ্টেন। ডাকল বিলি। একবার এদিকে এসো কথা আছে।

মুখের রক্ত মুছে এগিয়ে এলো রাণা।

—এসো আমার সাথে। বলল বিলি।...টম তুমিও এসো।

চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো।—তোরা সবাই যাচ্ছিস যে? কেমন যেন সন্দেহ ওর চোখেমুখে। বিলি বলল—আমরা সবাই যাবনা। নেবে গিয়ে গাছ ঠিক করে আসব—কোনটা থেকে স্ট্রেচার বানান যাবে। আমরা ফিরলে

অন্যদল যাবে স্ট্রেচার বানাতে। ভয় নেই, কেউ না কেউ থাকবে তোমার কাছে।

—যা যা। বলল গ্রাটেনকো। পালালে বাকিগুলোকে আমি খতম করে দেব। মনে থাকে যেন কথাটা।

—তুমি থাক হামিদুল এখানে। বলল রাণা। আমরা আসছি! প্লেন থেকে নেবেই বিলি জিজ্ঞাসা করল—আমরা কি যাব ওর সাথে?

টম বলল—যদি না যাই তবে?

বিলি বলল—ওর চোখ মুখ দেখে আমি বুঝেছি ও এখুনি গুলি করতো আমাদের। কিন্তু মনে রেখ যতক্ষণ আমরা ওর সাথে যেতে রাজী থাকব ততক্ষণ ও আমাদের ভয় দেখালেও প্রাণে মারবে না। কারণ ওভাবে বন্দী করতে পারলে ও গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অনেক সুবিধা আদায় করতে পারবে। সেটাই ও চায়। না গেলে সে সুযোগ না পাবার রাগে ও যা খুশি তাই করে বসতে পারে। তাছাড়াও যারা আমাদের খোঁজ নিতে আসবে—গুহায় লুকান আমাদের খুঁজে পাবে না। সেখানে ও নিজেও লুকিয়ে থাকবে। আমাদের না খুঁজে পেলেই ও সরকারকে যা খুশি তাই তাই সর্ত মানাতে পারবে। আমাদের ছেড়ে গেলে ও সে সুযোগ পাবে না।—এখন তোমরা কি ভাবছ বল।

টম বলল—আমাদের দলের কেউই এমন কিছু বড় নয় যে আমরা গায়ের জোর দেখাব।

অনেকক্ষণ ভেবে রাণা বলল—আগে সবার বাঁচার কথাই ভাবতে হবে। গুহার থেকে পরে আমরা তো সবাই পালাতে পারি! এমন কি সুযোগ পেলে আবার ওকে বন্দীও করতে পারি।

টম বলল—তাহলে আমরা সবাই যাব ওর সাথে।

—হ্যাঁ। রাণা বলল।—এ ব্যাপারে আমরা সবাই এক মত।

বিলি বলল—চল তাহলে এখুনি ফেরা যাক।

ওদের সবাইকে ফিরে আসতে দেখে গ্রাটেনকো মহা খুশি।

ফিরেই রাণা বলল—বিলি।—তুমি হামিদুল আর রাজা যাও স্ট্রেচার বানাতে। মুংলি আমি আর টম থাকব জিনিসগুলো খুলতে। কুণাল দেখবে আহতদের। বাকি সবাই ওকে সাহায্য করবে।

—ঠিক আছে ক্যাপ্টেন। বলল বিলি।—এসো তোমরা।

ডাক শুনে হামিদুল আর রাজা এগিয়ে গেল দরজার কাছে। ওদের পিছনে বিলি। দরজার কাছে গিয়ে ও ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—আর কতক্ষণ অমন করে বন্দুক উঁচিয়ে দাড়িয়ে থাকবে তুমি ভাল মানুষ গ্রাটেনকো? এবারে একটু বস।

—এই ও। চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। গালাগাল দেওয়া হচ্ছে আমাকে। সাহস তো তোর কম নয়। দেখবি মজা? গ্রাটেনকো ঘুরে দাঁড়াবার আগেই এক লাফে বিলি প্লেনের নিচে নেবে পড়ল। ওকে অমন করে পালাতে দেখে মহা খুশিতে গ্রাটেনকো আবার হাসতে লাগল। -ভয় পেয়েছে ও। খুদে শয়তানটা ভয় পেয়েছে। পাবেই তো। অমন প্রেসিডেণ্ট ব্রোকেনসিল সে পর্যন্ত আমার ভয়ে কাঁপে। আমার মাথার দাম তিন লাখ। আমি নিজের কথা ছাড়া আর কারও কথা ভাবিনি। ওর শেষ কথাগুলো বিড়বিড় করে বলতে বলতে ও এক জায়গায় ধপ করে বসে পড়ল। হাতের গানটা নিচে ফেলে পা ছড়িয়ে আরাম করে প্লেনের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসল।

দুচার মিনিট। তার পরেই প্রচণ্ড শব্দে ওর নাক ডাকতে লাগল।—ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রাটেনকো।

টম বলল।—দুঃখ হয় লোকটার জন্য।

—হ্যাঁ। বলল রাণা। ওর কথাও আমাদের ভাবতে হবে।

মুংলি বলল। সবার আগে দেখি ক্যাপ্টেন কোথায় তোমার চোট লেগেছে?

—না ও কিছু নয়। বলল রাণা।—ঠোঁটের ভিতরে কেটেছে। ও সেরে যাবে।

—ঠিক তো?

—হ্যাঁ কোন সন্দেহ নেই।

গ্রাটেনকোর দিকে তাকিয়ে তখন মুংলি বলল—আহা, ডাকাতটার বোধ হয় অনেক দিন কিছুই পেট ভরে খাওয়া হয় নি।

রাণা বলল—হামিদুল কিন্তু চলে গিয়েছে।

তাতে কি হয়েছে। বলল মুংলি—তুমি বললে শকুন্তলা আর রুক্মিণীকে ডাকব।

—ডাকো। কিন্তু আস্তে। ওর ঘুম যেন এখন না ভাঙ্গে। ভাঙ্গলেই মিছিমিছি চেঁচাবে।

মুংলি হাতছানি দিয়ে ডাকল ওদের। শকুন্তলা আর রুক্মিণী এলো কাছে।

—তোমরা পারবে কফি বানিয়ে আনতে।

হ্যাঁ পারব। দুজনেই ওরা মাথা নাড়ল।

—সাবধানে যাবে আসবে।

মহা খুশি হয়ে ওরা চলে গেল।

একটার পর একটা প্যাকেট ওরা খুলতে লাগল। প্রথমেই বার হল নানান ওষুধপত্র। তার সাথে লেখা কাগজ। কেমন করে কোনটা ব্যবহার করতে হবে। পরেরটাতে খাবার। আর একটাতে পোশাক। বিছানা পত্র।

টম বলল—আহা একটা বন্দুক দেয় নি।

পরের প্যাকেটটা খুলতেই বার হল একটা যন্ত্র। সেটা দেখেই লাফিয়ে উঠল টম। আরে এযে দেখছি পোর্টেবল রেডিও যন্ত্র। তাড়াতাড়ি বাক্সটা হাতড়াতে সুরু করল ও। এই তো পেয়েছি। বলে একটা ছাপান কাগজের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও! কিছুক্ষণ। তাই পড়েই টান দিয়ে এরিয়ালটাকে লম্বা করে দিল। আর একটা বোতাম টিপেই হেড ফোনটা কানে দিয়ে শুনতে পেল ওদিক থেকে বলছে—ব্রাণ্টালুসির উদ্ধারকারীরা বলছি। তোমরা সাড়া দাও। সাড়া দাও। ব্রাণ্টালুসির উদ্ধারকারীরা বলছি। তোমরা সাড়া দাও। সাড়া দাও। বল।

খট করে আর একটা বোতাম টিপল টম। তারপর উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল।—হ্যালো ব্রাণ্টালুসির উদ্ধারকারীরা, আমরা বেঁচে আছি। শুনতে পাচ্ছ? আমরা বেঁচে আছি। বল।

আবার বোতাম টিপতেই ওদিক থেকে শুনতে পেল।—প্লেন এ্যাক্সিডেণ্টের যাত্রী তোমরা?

—হ্যাঁ।

—ভগবানের দোহাই—সবাই বেঁচেছে?

—না দুঃখিত। ষোল জন বেঁচেছি।

—দুঃখিত আমরাও। নাম বল। শিগগির।

মুখস্থের মতন নামগুলো বলে গেল টম।

—আহত ক'জন?

—তিনজন।

—আঘাত গুরুতর কি ?

—হ্যাঁ দুজনের গুরুতর।

—আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা কর শিগগির। যাতে ধোঁয়া হয়। আমরা ডাক্তারকে নাবাবো। কেউ ফার্স্ট্ এইড জানে ?

—হ্যাঁ জানে। তার সাথে কথা বলুন।

—হ্যাঁ সেই ভাল। এখানেও ডাক্তারের সাথে কথা বল।

মুংলি হেড ফোনটা কানে দিতেই ওদিক থেকে আওয়াজ উঠল—হ্যালো। হ্যালো—ডাক্তার বলছি।

—আমি মুংলি টিরকে। আমি ফার্স্ট্ এইড জানি। উত্তর দিল মুংলি—তনুক্কা দিদির দুটো পায়েই সিনবোন ভেঙ্গেছে। তবে মনে হয় সাধারণ ভাঙ্গা। কিন্তু উপরের মাংস থেঁতলে গেছে। গুরুদিতের কোথাও আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। তবে ও থেকে থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। জ্ঞান ফিরলেও উঠতে পারছে না। হাত-পা নাড়তে পারলেও সমস্ত শরীর ওর অবশ। ওকে নিয়েই সব থেকে ভয়। বাকিজন আমিনা—তার ডান পায়ের আর হাতের মাংস ছিঁড়ে গেছে আমি ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছি। ওর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

—বেশ। ওদিক থেকে ডাক্তার বলল। এখন খুব মন দিয়ে শোন কি করতে হবে।

সব কথা মন দিয়ে শুনল মুংলি। ওর ডাকে ওর পাশে এসে বসল কুণাল। ওষুধের প্যাকেট খুলে যেই ওষুধ বাছাই করতে যাবে। অমনি ঘুম ভেঙ্গে গেল গ্রাটেনকোর।

—কার সঙ্গে কথা বলছিস তোরা ? ওটা কি ?

—ওটা রেডিও। বলল টম। আমাদের যারা উদ্ধার করতে আসবে তাদের সাথে কথা বলছি।

একথা শুনে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। তারপর সুড়সুড় করে এসে বসল ওদের পাশে।

—কি কথা বলছিস তোরা ? কি কথা ?

—আহতদের কেমন করে ওষুধ দেব সেই কথা।

—আর কোন কথা হয়নি এখনো ?

—না।

—বেশ তোরা বলে দে যে তোরা সবাই এখন গ্রাটেনকোর বন্দী। ওরা এ জঙ্গলে তোদের খুঁজতে আসলেই আমি তোদের খুন করব। সব কটাকে খুন করব। বল বল একথা ওদের। এরপর এ জঙ্গলে ঢোকা না ঢোকা ওদের ইচ্ছা।

আবার সবাই থমকে গেল। আসল কথাটা তাহলে ও এখনও ভোলে নি। তবে সত্যিই শয়তান !

—চুপ করে রইলি যে। বল বলছি। এখুনি। ধমকে উঠলো গ্রাটেনকো।

ততক্ষণে ওদিক থেকে ডাকা শুরু হয়ে গেছে। হ্যালো হ্যালো। কি হল হঠাৎ। কি হল। জবাব দাও শিগগির। বল। জবাব দাও। শুনতে পাচ্ছ আমাদের কথা ? হ্যালো—ঝপ করে হেড ফোন কেড়ে নিজের কানে ধরল গ্রাটেনকো কান পেতে কিছুক্ষণ—ঐ তো ওরা শুনতে চাইছে। চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো বল্ বল্—যা বলতে বললাম বল্ বলছি। নইলে এখুনি তোর মুণ্ডু গুঁড়ো করে দেব।

—বেশ বলছি। বলল্ টম। নিজের হাতে যন্ত্রটা নিয়ে স্পষ্ট গলায় ও বলল—সব কথাই শুনতে পাচ্ছি আমরা।—সব কথা। এখানে আমরা এখন গ্রাটেনকোর বন্দী .....

এই পর্যন্ত বলার সাথে সাথেই গ্রাটেনকো চেঁচিয়ে উঠল।

—খবরদার—কোথায় তোদের নিয়ে যাব তা বলবি না। খবরদার বলবি না বলছি। শুধু বলে দে লোক খুঁজতে এলেই তোদের খুন করব! বল, বল এ কথা গুলো।

—হ্যালো হ্যালো। আবার বল কথা গুলো। হ্যালো ওদিকের ব্যাকুল ডাক শোনা যেতে লাগল।

—বলছি। এখানে আমরা সবাই এখন গ্রাটেনকোর বন্দী। ও আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে অন্য জায়গায়। লোক এ জঙ্গলে আমাদের খোঁজে ঢুকলেই গ্রাটেনকো আমাদের সকলকেই গুলি করবে।

গ্রাটেনকো আমাদের গুলি করবে।

কথাটা শেষ করেছে কি করে নি টম···অমনি ঝপ করে ওর হাত থেকে রেডিও যন্ত্র কেড়ে নিল গ্রাটেনকো।

—ব্যাস খুব হয়েছে কথা বলা। এখন ওটা আমার কাছে থাক। যখন আমার দরকার পড়বে তখন আবার বলবি। এখন সবাই উঠে পড়। যেতে হবে। জিনিসপত্র যা পারিস তা সঙ্গে নিয়ে নে। বাকি যা সব তা যেমন আছে থাক। ও পরে আমার কাজে লাগবে। সবাই উঠে পড়।

—স্ট্রেচার বানিয়ে তো ওরা এখনও ফিরল না। ব্যস্ত হয়ে রাণা বলল।

—শয়তানগুলো নিশ্চয় পালিয়েছে। ধরতে পারলে ওদের আমি জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব। আমায় চেনে না।

—আবার বাজে কথা। বাধা দিল রাণা। বলেছি তো আমাদের ফেলে আমাদের কেউই কোন দিনও চলে যাবে না। ওরা এখুনি এসে যাবে! তুমি দেখো।

শকুন্তলা আর রুক্মিণী তখুনি ফিরল গরম কফি হাতে নিয়ে।

ক্রমশঃ

নয় সে রাজা, নয় সে রাণী

নির্মলেন্দু গৌতম

নয় সে রাজা, নয় সে রাণী
কেবল তাসের জোকার,
আজকে হঠাৎ বেজায় রকম
বন্ধু হল খোকার

সবাইকে সে এড়িয়ে এসে
বারান্দাটির কোনায়,
নানান রকম গল্প তাকে
দুপুর বেলা শোনায়।

জোকার সে তো খোকার কাছে
দারুণ মজার মানুষ
শুনুক কিছু, নাইবা শুনুক,
ওড়ায় খুশির ফানুস!

হঠাৎ যদি এসেই পড়,
বুকপকেটে খোকার—
দেখতে পাবে, হাসছে কেবল
সেই সে তাসের জোকার॥

প্রতিরক্ষা

সুনীলরঞ্জন দত্ত
(কারিগরি বিজ্ঞান)

কে জানে কবে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। দমাদম্ বোমা ফাটবে। শত সহস্র মানুষের প্রাণ নাশ হবে, সমৃদ্ধ নগর জনপদ ধ্বংস হবে, দুর্ভিক্ষ মহামারিতে দেশ ছেয়ে যাবে, ক্ষুদ্র শক্তি সম্পন্ন দেশ পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হবে। ঠিক এই আশংকাতেই পৃথিবীর ছোট বড় সব দেশই প্রয়োজন মত যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করে রাখে। দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সদাসতর্ক দৃষ্টি নিয়ে জেগে থাকে সীমান্তের গা ঘেঁষে, কিন্তু প্রয়োজন মত অস্ত্র তৈরি করার ক্ষমতা পৃথিবীর কটা দেশেরই বা আছে। অনেক দেশ নিজেকে বলশালী করার জন্য বিদেশী রাষ্ট্র থেকে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করে। তবে কম হোক বেশি হোক সব দেশই প্রয়োজন মতো সরঞ্জাম নিজেরাই প্রস্তুত করার চেষ্টা করে। তার কারণ অস্ত্রের ব্যাপারে পরমুখোপেক্ষী হয়ে থাকার বিপদ আছে অনেক। আমাদের দেশ এতদিন যুদ্ধের প্রায় সব রকম অস্ত্রই বিদেশ থেকে আমদানি করত। এখন কিছু কিছু সরঞ্জাম দেশেই প্রস্তুত হয়।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করার অধিকার এখনও লাভ করে নি। সরকারি এবং আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিই এ সব প্রস্তুত করে। জলযুদ্ধের জন্য যুদ্ধজাহাজ অপরিহার্য অঙ্গ। আমি এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি যে প্রতিষ্ঠান যুদ্ধজাহাজ এবং যুদ্ধের কাজে লাগতে পারে এমন সব জাহাজ প্রস্তুত করে। যারা খবরের কাগজ পড় তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ ১৯৬৮তে ২৩শে অক্টোবর 'আই, এন্, এস্ নীলগিরি' নামে একটি যুদ্ধের জাহাজ জলে ভাসানো হয়েছে। এ জাহাজটি আমাদের তৈরি প্রথম যুদ্ধের জাহাজ, সম্পূর্ণ হতে এখনও প্রায় তিন বৎসর লাগবে। তারপর জাহাজটিকে নৌবাহিনীর হাতে অর্পণ করা হবে। এটি সম্পূর্ণ একটি আধুনিক ধরনের যুদ্ধের জাহাজ এবং এর কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে, যেমন—এ জাহাজটি সাবমেরিন আক্রমণ করতে পারবে, আণবিক শক্তি চালিত অস্ত্র বহন করার ক্ষমতাও এ জাহাজটির থাকবে, তাছাড়া এ জাহাজটিতে Guided Missileএর ব্যবস্থা থাকবে। অর্থাৎ স্বয়ংচালিত মিসাইল ক্ষেপণ ও তাকে নির্দেশ দেবার ব্যবস্থা থাকবে। ঐ একই ধরনের আরও দু'খানা যুদ্ধের জাহাজ আমাদের প্রতিষ্ঠানে তৈরি হবে। এ জাহাজগুলি দৈর্ঘ্যে ৩৭২ ফুট প্রস্থে ৪৩ ফুট এবং উচ্চতায় ২৮ ফুট ৩ ইঞ্চি। 'নীলগিরি' হ'ল ভারতীয়দের দ্বারা ভারতে তৈরি প্রথম ভারতীয় যুদ্ধের জাহাজ। তাহলেও এই জাহাজ তৈরির সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কেবলমাত্র

ভারতীয়দের নয়। তার কারণ এই আধুনিক যুদ্ধ জাহাজের নক্সাটি আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে নিয়েছি।

নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে ভারত 'আই, এন্, এস্ কাল্‌ভারি' নামে একটি সাব্‌মেরিন রাশিয়া থেকে আমদানী করেছে। সাব্‌মেরিনের কি কাজ তা তোমরা ভাল করেই জান, যুদ্ধের সময় এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। এ ছাড়া 'আই, এন্, এস্, দীপক' নামে যুদ্ধের কাজে লাগতে পারে মাল ও তেলবাহী এমন একটি জাহাজ জার্মানী থেকে আমদানী করা হয়েছে। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন আমরা 'আই, এন্ এস্ ভাট্‌কাল' নামে একটি ইন্‌শোর মাইন সুইপার (inshore mine-sweeper) তৈরি করে ভারতীয় নৌবাহিনীর হাতে দিয়েছি।

যুদ্ধের খবরাখবর যারা রাখ তারা 'মাইন' কথাটা নিশ্চয়ই শুনেছ। এটি যে কি মারাত্মক অস্ত্র তা বলে বোঝানো যাবে না। স্থলযুদ্ধে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার জন্য যেমন মাটির নিচে 'মাইন' পেতে রাখা হয় তেমনি যুদ্ধের জাহাজ ধ্বংস করার জন্য বিপক্ষীয় সৈন্যরা জলের নিচে মাইন সাজিয়ে রেখে যায়। মাইনের চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি থাকে। যুদ্ধের জাহাজগুলি সবই লোহার তৈরি, তাই মাইনের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে জাহাজ এসে পড়লে আকর্ষণী শক্তির জোরে মাইনগুলি জাহাজের গায়ে এসে ধাক্কা লাগে, তার ফলে মাইন বোমার মতন ফেটে যায়। তার কারণ হল মাইন বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে তৈরি। বিস্ফোরণের ফলে জাহাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং জলে ডুবে যায়। 'সুইপ' (sweep) কথাটার মানে তো তোমরা জান—ঝাঁট্ দেয়া, মাইন সুইপারের কাজ হল মাইনগুলিকে ঝাঁট দিয়ে সরিয়ে ফেলা। কথার মানেটা এ রকম হলেও আসল কাজটা একটু অন্য রকম। যুদ্ধ জাহাজের আগে আগে চলে 'মাইন সুইপার', যে পথ ধরে যুদ্ধ জাহাজ যায় সেই পথে যত 'মাইন' সাজানো থাকে সেগুলি তুলে নেওয়া হল 'মাইন সুইপারের' কাজ। মাইন কখনও 'মাইন সুইপারের' ক্ষতি করতে পারে না তার কারণ 'মাইন সুইপারের' দেহটি কাঠ দিয়ে তৈরি। ফলে মাইনের চৌম্বক আকর্ষণী শক্তিটা অকেজো থাকে। 'আই, এন্ এস্ ভাট্‌কাল' সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি। তার যে অংশটা সব সময় জলের নিচে থাকার সে অংশটা 'ফাইবার গ্লাস' (Fibre Glass) দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। তা না হলে বহুদিন জলে থাকার জন্য কাঠ দিয়ে তৈরি দেহটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মাইন সুইপারগুলি আকারে খুবই ছোট হয়, আই, এন্, এস্ ভাটকাল মাত্র ৩২½ মিটার লম্বা।

এক একটা দেশের আর্থিক সম্পদের বিরাট একটা অংশ যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য ব্যয় হয়ে যায়। পৃথিবীর সব দেশই যদি পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হত, দ্বেষ, হিংসা ভুলে যেত, দুর্বলের উপর আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্খা মন থেকে মুখে ফেলতে পারত,—সব দেশই যদি যুদ্ধকে পরিহার করে শান্তির পথ বেছে নিত, তাহলে ঐ অর্থ সম্পদ আরো অনেক ভাল কাজে লাগতে পারত, শিক্ষার জন্য আরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হত। ক্ষেত খামারে বেশি ফসল ফলানো সম্ভব হত, সব মানুষই সুখে থাকত। পৃথিবীর চেহারাটাই হয়তো পাল্টে যেত। কিন্তু তেমন দিন কবে আসবে?

বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

অমিতানন্দ দাশ

প্রশ্ন : টেলিভিশনে ছবি পাঠানো হয় কি করে ? (১৯০২ অভিজিৎ চৌধুরী)

টেলিভিশন কি করে কাজ করে বোঝানোর প্রথম মুস্কিল হলো যে ভারতবর্ষে এখন টেলিভিশন নেই বললেই চলে, যদিও বছর চারেকের মধ্যেই কলকাতাই টেলিভিশন বসার কথা আছে। কাজেই তোমরা যারা মাঝে-মাঝে টেলিভিশন দেখেছো, সম্ভবতঃ কখনো টেলিভিশনের ছবিটাকে বিশদভাবে লক্ষ্য করে দেখোনি। কিন্তু টেলিভিশনে ছবি পাঠানোর একটা গোড়ার কথা পাঠানো ছবিটাকে ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। রেডিওতে নাহয় কথাগুলো একের পর এক পাঠানো হয়, কিন্তু টেলিভিশনে একটা পুরো ছবি একসঙ্গে পাঠানো যায় কি করে ? তা পাঠানোর আসলে কোনো উপায়ই নেই। কিন্তু ধর একটা ছাপা পৃষ্ঠাও তো কিছুটা একটা ছবির মতো। এই পৃষ্ঠাটা তুমি কিভাবে পড়ছো ? পর পর এক একটা লাইন ধরে বাঁদিক থেকে ডানদিকে পড়ে যাচ্ছো, আবার চট করে বাঁয়ে ফিরে এসে পরের লাইন পড়তে শুরু করছো তো ? টেলিভিশন ক্যামেরাও ঠিক তাই করে। টেলিভিশন ক্যামেরা এক ধরনের রেডিও ভাল্‌ভ—এর কাজ হচ্ছে যে ছবিটাকে পাঠাতে হবে সেটাকে এইরকম 'পড়ে যাওয়া।' তাই টেলিভিশনের ছবিটাও অনেকগুলি লাইনে ভাগ করা থাকে—কাছ থেকে একটা টেলিভিশন ছবিকে দেখায় এই পৃষ্ঠাটাকে মিটার পাঁচেক দূর থেকে যেরকম দেখায় সেরকম আরকি। বিভিন্ন দেশের টেলিভিশনে বিভিন্ন সংখ্যায় লাইন থাকে—৫০০ থেকে ৯০০র মধ্যে।

খবরের কাগজের অনেক ছবির তলায় 'রেডিও ফটো' লেখা দেখেছো নিশ্চয়ই। সেই ছবি পাঠানোর সঙ্গেও টেলিভিশন ছবি পাঠানোর কিছু সাদৃশ্য আছে। খবরের কাগজের হাফটোন ছবি দেখবে অনেকগুলি ফুটকির সমষ্টি—রেডিওতে এই ফুটকিগুলি এক এক করে পাঠানো হয়। ফুটকি তো দেখেছো ছবির কালো অংশে থাকে বিরাট বিরাট—তারা একটার ঘাড়ে আরেকটা গিয়ে পড়েছে, কিন্তু ছবির সাদা অংশে তাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এখন ছবি-প্রেরক যন্ত্রে এক-একটি ফুটকিকে লক্ষ্য করে, ফুটকি যত বড় তত বেশী বৈদ্যুতিক কারেণ্ট সৃষ্টি করা হয় এবং এই কারেণ্ট অনুযায়ী রেডিও তরঙ্গ পাঠানো হয়। গ্রাহকযন্ত্রে আবার ওই কারেণ্ট অনুযায়ী ছোট বড় ফুটকি বসিয়ে ছবিটিকে ফিরে পাওয়া যায়।

টেলিভিশনে প্রায় ঠিক এইরকম ভাবেই ছবিটি পাঠানো হয়—খালি ডাইনে বাঁয়ে পাশাপাশি 'ফুটকি' বলে কিছু থাকে না, সব জুড়ে কখনো গাঢ় কখনো হালকা এক একটা লাইন হয়ে যায়।

টেলিভিশনের মূল সমস্যা হলো যে এক একটি 'ফুটকি'কে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয়। কারণ সিনেমার মতো টেলিভিশনেও অনেকগুলি স্থির ছবি পর পর দেখানোর ফলে আমাদের ধারণা হয় যে ছবিগুলিই নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। এর জন্য সেকেণ্ডে অন্ততঃ ২৫টির মতো ছবি দেখানো দরকার হয়। এখন টেলিভিশনের প্রতি ছবিতে যদি ৫০০টি লাইন থাকে, এবং প্রতি লাইনে যদি ৫০০টি

'ফুটকি' থাকে, তবে প্রতি ছবিতে 'ফুটকি' আছে ৫০০ × ৫০০ = ২৫ হাজারটি। আর প্রতি সেকেণ্ডে ২৫টি ছবি পাঠাতে এক সেকেণ্ডে 'ফুটকি' পাঠাতে হয় ২৫,০০০ × ২৫ = ৬½ লক্ষটি!

বোঝ তাহলে কেন হাজার টাকার কমে টেলিভিশন সেট পাবার আশা কম! ৩ ভাল্‌ভ বা ৫ ট্রানজিস্টারে রেডিও সেট হয়। কিন্তু ১৫ ভালভ বা ৩০ ট্রানজিস্টারের কমে টেলিভিশন সেট বানাতে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। তাছাড়া টেলিভিশন সেটে একটা বিরাট ভাল্‌ভ লাগে, 'পিকচার টিউব, যার গায়ে ছবিটা দেখা যায় অনেকটা টিউনিং ইণ্ডিকেটারের এক বড় সংস্করণের মত—তার একার দামই বেশ কয়েকশো টাকা।

পিকুর অভিজ্ঞতা

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

পিকু। ও তোমরা বুঝি তাকে চেননা! পাঁ-চ বছর বয়স তার। সকাল থেকে পিকুর কত কাজ। খাঁচার ময়নার সঙ্গে কথা বলা, কুকুরের সঙ্গে বল খেলা। এমনি ক—ত কি! কিন্তু দাদা দিদি পিকুর কাজের কথা শুনে হেসেই খুন হয়। এজন্য পিকুর মনে ভারী দুঃখ।

একদিন ভোরবেলা, সুষ্যিমামা সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন, এমনি সময় পিকুর ঘুম গেল ভেঙে। সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠেই বাগানে দৌড় দিল পিকু। আরে, মালীদাদা এখনও ঘুম থেকেও ওঠেনি; কখনই বা গাছে জল দেবে! আর কখনই বা পিকু কুকুরের সঙ্গে বল খেলবে! পিকু ত ভেবেই পেলনা।

এমন সময়ে পিকু দেখে আমগাছের তলায় চলেছে পিঁপড়ের সারি, তাদের দেখে পিকু মজা করে নিজের বিস্কুট থেকে ভেঙে তাদের বাসার সামনে ফেলল। তখন একটা ছোট্ট পিঁপড়ে সেটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসেই একটুখানি বিস্কুটের গুঁড়ো মুখে করে নিয়ে বাসার মধ্যে রাখল। একবারই নয়, বারবার এসে ছোট পিঁপড়েটি বিস্কুটের গুঁড়োগুলি বাসার মধ্যে নিয়ে রাখল। ছোট্ট পিঁপড়ের এই কাজ দেখে পিকুর চোখ ত ছানাবড়া। সে তক্ষুনি মায়ের কাছে ছুটে পিঁপড়ের কথা বলল। মা তখন পিকুকে কোলে নিয়ে 'ছোট হলেও যে প্রত্যেকের কাজই যে বড়' সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

ধারাবাহিক উপন্যাস

(সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলে, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২৩ জন।

এঁরা এক আশ্চর্য নগরীর সন্ধান পান। সমুদ্রগর্ভে বিশাল এক 'আশ্রয় সদনে' কৃত্রিম বাতাসের সাহায্যে জীবনধারণ করে উন্নত বিজ্ঞান সম্পন্ন এক জাতি—তাদের কাছে আশ্রয় পাওয়া গেল। এরা প্রাচীন আটলান্টিস-বাসীদের বংশধর।

বাইরের দুনিয়ায় সংবাদ পাঠাবার জন্য ম্যারাকট আটলান্টিসের রসায়নবিদদের আবিষ্কৃত অতি হালকা লাঘবজান গ্যাসের সাহায্যে কাঁচগোলকের মধ্যে করে নিজেদের অভিজ্ঞতার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিখে ভাসিয়ে দিলেন।

কয়েকটি কাঁচগোলকের সাহায্যে তাঁরা অনায়াসে ভেসে উঠে উদ্ধারকারী 'ম্যারিয়ন' জাহাজে আশ্রয় পান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন 'জলকুমারী' সোনা। তাঁদের কাছ থেকে পৃথিবীর মানুষ সমুদ্রগর্ভের বহু বিচিত্র, ভয়াবহ এবং অদ্ভুত দৃশ্যের কথা জানতে পারল।)

(তেরো)

"তবে সাগরগর্ভে যত অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলাম তার সবগুলিই যে ভয়ানক তা নয়। একটি দৃশ্য মনে পড়ছে যার স্মৃতি কোনোদিন মুছবার নয়। সমভূমির যে অংশ আমাদের বেশ চেনা হয়ে গিয়েছিল সেইখান দিয়ে একদিন আমরা যাচ্ছি, হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলাম অনেকখানি ফিকে হলদে রঙের বালি—বিস্তারে প্রায় আধ একর হবে—যেন কেউ কোথাও থেকে এনে বিছিয়ে রেখেছে। আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কোন অন্তঃসাগরীয় স্রোত বা কি ধরণের ভূকম্পনের ফলে এমনটা হল, এমন সময়ে দেখলাম সেই সমস্ত বালি একটা

বিশাল চাঁদোয়ার মত উপরে উঠে পড়ল আর অল্প অল্প ঢেউ খেলিয়ে আমাদের মাথার উপর দিয়ে যেতে লাগল। সবটা যেতে অন্ততঃ মিনিট দুয়েক লাগল। প্রফেসর বললেন আমরা ইংল্যণ্ডে যে সব মাছ দেখি তারই একটা ছোট জাতের মাছের এটা অতিকায় সংস্করণ।'

'তেমনি আবার ঘূর্ণবাত বা প্রচণ্ড ঘূর্ণি-ঝড়ের সামুদ্রিক সংস্করণ—একে কি বলব, ঘূর্ণ-বারি?—তাও দেখেছি। আমাদের এই উপরের পৃথিবীতে ঘূর্ণবাত যেমন সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে ভেঙে চুরে প্রলয়কাণ্ড বাধায়, সমুদ্রের তলায় ঘূর্ণ-বারিও তেমনি। তবে সব রকম প্রাকৃতিক ব্যাপারে মত এরও একটা উদ্দেশ্য আছে, মাঝে মাঝে জলের মধ্যে এমনি বিরাট তোলপাড় না হলে স্থির জল ক্রমশঃ মজে উঠত।

'স্কার্পার মেয়ে সোনার কথা আগেই বলেছি। একদিন তার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েই প্রথম এই ঘূর্ণ-বারির খপ্পরে পড়েছিলাম। আশ্রয়সদন থেকে মাইল খানেক দূরে একটা উঁচু বাঁধের মত ছিল, তার উপরে নানা রঙের সামুদ্রিক ঝাঁজির মেলা। সেটি সোনার সখের বাগান। বৈজ্ঞানিক ভাষায় তার বর্ণনা দিতে গেলে অবশ্য শুনতে কিম্ভুত লাগবে, যেমন পারুল রঙের উরঙ্গামী, নীল-লোহিত অহিলুমন্, রক্তবর্ণ সমুচ্চণ্ড এই সবের ছড়াছড়ি জড়াজড়ি! সেদিন সে আমাকে তার বাগান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা সেইখানে বসে আছি এমন সময় ঝড়—জলের ঝড়—এসে পড়ল। আমরা দুজন দুজনের হাত শক্ত করে' ধরে' পাথরের ঢিবির পিছনে আশ্রয় নিয়ে বহু কষ্টে নিজেদের ভেসে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচালাম। দেখলাম এই ঝড়ের মত স্রোতের জলটা রীতিমত গরম, আর একটু গরম হলেই হয়ত গায়ে ফোসকা পড়ত। হয়ত সমুদ্রের তলায় আছে কোথাও কোনো জীবন্ত আগ্নেয় গিরি, তারই উৎপাতের ফলে ছুটে আসছে এই স্রোত। সেই স্রোতের তোড়ে সমভূমির পাঁক ঘুলিয়ে উঠে চারিদিক অন্ধকার করে' ফেলল। তাতে আমাদের একেবারেই দিক্ ভুল হয়ে গেল, পথ চিনে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, তা ছাড়া এমনিতে স্রোতের মধ্যে চলাও প্রায় অসম্ভবই। তার উপর আবার বুকে ভারবোধ আর নিঃশ্বাসের কষ্ট সুরু হল, বুঝলাম আমাদের অক্সিজেনের যোগান ক্রমে ফুরিয়ে আসছে।

'এমনি সময়ে শুনতে পেলাম যেন দূর থেকে খুব বড় একটা কাঁসর পেটার মত কোনো আওয়াজ আসছে। অথচ এমনিতে সাধারণ কোনো আওয়াজ আমাদের কাঁচের পোষাকের মধ্যে প্রায় ঢুকতেই পারত না। যা হোক, সেটা যে কিসের শব্দ আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দেখলাম সোনা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে। আমার হাত ধরে' সে উঠে দাঁড়াল, কান পেতে যেন সেই আওয়াজ শুনল, তার পর নুয়ে পড়ে' সেই স্রোতের ঝড় ঠেলে চলতে সুরু করল। সে যেন মরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়, প্রতি মুহূর্তে আমার বুকের উপরকার সেই ভয়ানক ভারবোধ আরও অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। সে যেদিকে আমায় নিয়ে চলল আমি টলতে টলতে সেই দিকেই চললাম। তার মুখ আর চলবার রকম দেখে মনে হল তার অক্সিজেন আমার মত অত কমে' যায় নি। এক সময় হঠাৎ আমার চারিদিকে সব কিছু যেন ঘুরতে লাগল, আমি দুহাত মেলে সমুদ্রের গরম মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।'

'যখন জ্ঞান হল দেখলাম আশ্রয় সদনে নিজের কৌচটিতে শুয়ে আছি। সেই হলদে পোষাক পরা বৃদ্ধ পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে ওষুধের শিশি। ম্যারাকট আর স্ক্যান্‌ল্যান্ চিন্তিত মুখে আমার উপর ঝুঁকে রয়েছেন; আর সোনা বিছানার পাশে আমার পায়ের দিকে হাঁটু গেড়ে বসে, তার মুখে স্নেহ আর উদ্বেগ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। ক্রমে জানলাম দুর্যোগের সময় বাইরে দূরে গিয়ে পড়া লোকদের জন্য আশ্রয় সদনের প্রবেশদ্বার থেকে একটা বিরাট কাঁসর বাজানো হয়।

সোনা সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে এসেছিল তারপর আর কয় জন আর ম্যারাকট ও স্ক্যান্‌ল্যান্‌কে সঙ্গে করে

পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় আমার কাছে। তখন সকলে আমাকে তুলে নিয়ে আসেন। জীবনে আমি এর পরে যাই করি সে জন্য আমি সোনার কাছে ঋণী।

'সোনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে বাস্তবিক কত গভীর তা তার বাবা স্কার্পাই একদিন আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। একদিন তিনি আমাদের দুজনকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের ঘরে। সেখানে সেই চিন্তা-প্রতিফলক রুপালী পট খাটালেন। সোনা আর আমি হাত ধরাধরি করে বসে দেখতে লাগলাম। যা দেখলাম তা হয়ত স্কার্পার আগের আগের জন্মের স্মৃতি। প্রথমে দেখলাম সুন্দর নীল সমুদ্রের মধ্যে আগু হয়ে এসেছে একটা পাথুরে অন্তরীপ। তার উপরে একটা প্রাচীন ছাঁদের বাড়ি। তার চারিদিকে নারকেল বন।

মনে হল কারা যেন সেই নারকেল-বনের মধ্যে তাঁবু ফেলে রয়েছে। পাতার ফাঁকে সাদা তাঁবুর খানিক খানিক দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, আর কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছিল অস্ত্রের চকমকি, মনে হচ্ছিল কোনো প্রহরী তাঁবু পাহারা দিচ্ছে।

একজন মাঝ বয়সী লোক সেই নারকেল-বন থেকে বেরিয়ে এল, তার গায়ে লোহার সাজোয়া, হাতে ঢাল। অন্য হাতে তলোয়ার বা বর্শা কিছু একটা যেন ছিল। সে একবার আমাদের দিকে মুখ ফেরাতেই আমি বুঝলাম সে এই আটলান্টীয়দেরই সমগোত্র, এমন কি তাকে স্কার্পারই যমজ ভাই বলা যেতে পারত, কেবল তার মুখের চেহারা কর্কশ আর হিংস্র, তাতে মানুষ আর পশুর এক ভয়ঙ্কর সংমিশ্রণ। এই যদি স্কার্পার কোনো আগের জন্মের চেহারা হয়ে থাকে তাহলে বুদ্ধির দিক দিয়ে যতনা হোক মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে তিনি সেই পুরাতন স্কার্পার থেকে এখন অনেক উঁচুতে উঠেছেন।

'সাঁজোয়া পরা লোকটি সেই বাড়ির কাছে আসতে একটি অল্প বয়সী মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ভাবে মনে হল সে সেই লোকটিরই মেয়ে। লোকটি কিন্তু অযথা ক্ষেপে উঠে মেয়েকে মারতে গেল। মেয়েটি ভয়ে পিছিয়ে যেতেই সূর্যের আলো পড়ল তার সুন্দর মুখে, দেখলাম সে আর কেউ নয়, সোনা।

'রুপালী পর্দা ঝাপসা হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে আবার আর একটি ছবি ফুটে উঠতে লাগল। পাহাড়ে ঘেরা এক সমুদ্র। ডাঙা থেকে অল্প দূরে একটা অদ্ভুত গড়নের নৌকা। তার দুদিকের গলুই খুব উঁচু, ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। তখন রাত্রি, জলের উপর জ্যোৎস্নার আলো চকচক করছে।

আমাদের চেনা তারাগুলি সেই আকাশেও জ্বলছিল। আস্তে আস্তে, যেন চুপি চুপি, নৌকাখানা এসে ডাঙায় লাগল। দুইজন লোক নৌকা বাইছিল, আর একজন সারাগায়ে কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে গলুইয়ের উপর বসে ছিল। এখন সে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সেই উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় আমি তার মুখ-খানা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সে আর কেউ নয়, আমি!

'হ্যাঁ আমিই আজকালকার নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ডের সাইরাস হেডলে, আধুনিক জগতের মানুষ এই আমিই একদিন পুরাকালের এই বিরাট আটলান্টীয় সভ্যতার অংশস্বরূপ ছিলাম। তখনই আমি বুঝতে পারলাম কেন সাগরতলের সেই রাজ্যে আমার চারিপাশের সাঙ্কেতিক চিহ্ন আর লেখাগুলি আমার অজানা হয়েও একটা নাম-না-জানা পরিচয়ের আভাস এনে দিত। সোনার সঙ্গে প্রথম দেখায় কেন এত আনন্দ হয়েছিল তাও তখনই বুঝলাম। এসবের কারণ ছিল আমার মনের ঘুমন্ত অংশটুকুর গহন অন্তস্তলে, যেখানে সঞ্চিত ছিল বারো হাজার বছরের স্মৃতি।

'একটু পরেই বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। তাকে আমি—সেই আমি—প্রায় তুলেই নৌকার উপর নিয়ে এলাম। এমন সময় একটা গোলমাল উঠল, আমি ক্ষেপার মত প্রাণপণে ইসারা করতে

লাগলাম নৌকা ছেড়ে দিতে। কিন্তু তার মধ্যে বনের ভিতর থেকে দলে দলে লোক এসে পড়েছে। অনেকগুলি হাত এসে পড়ল নৌকার উপর। আমি তাদের মেরে তাড়াবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। তার মধ্যে একজনের কুঠার শূন্যে ঝলকে উঠে আমার মাথায় পড়ল। আমি মরে' পড়ে' গেলাম সেই মেয়েটির গায়ের উপর, সে পাগলের মত চীৎকার করতে লাগল। তার বাবা ছুটে এসে তার লম্বা কালো চুলের মুঠি ধরে' আমার মৃতদেহের তলা থেকে তাকে টেনে বার করল। সেই স্কার্পা, আর সেই সোনা!

"আবার আর এক ছবি জ্বলে উঠল। জাতির চরম বিপদের দিনে আশ্রয় পাবার জন্য সেই মহাজ্ঞানী আটলাণ্টায় যে বিশাল শরণালয় তৈরী করিয়েছিলেন তারই ভিতরের দৃশ্য। যারা আশ্রয় নিয়েছে তার ভিতর তাদের মুখে কি আতঙ্ক। সেইখানে সোনাকে আর একবার দেখলাম। আর দেখলাম তার বাবাকেও, তিনি তখন আর আগেকার মত নন, তাঁর মুখের ভাব, তাঁর আচরণ, সবই অনেক উন্নত স্তরের। সেই বিশাল বাড়ির সমস্ত ভিতরটা দুলতে আরম্ভ করল, যেমন করে ঝড়ে জাহাজ দোলে। শরণার্থীরা কেউ বা থাম আঁকড়ে রইল, কেউ বা পড়ে' গেল মেঝের উপর। তার পর বাড়িটি বসে যেতে লাগল, ক্রমশঃ নীচে নামতে নামতে শেষে এসে পৌঁছাল সমুদ্রের তলায়। ছবি মিলিয়ে গেল, স্কার্পা আমাদের দিকে ফিরে মৃদু হেসে জানালেন এই শেষ।

'এর কিছু দিন পরে সেখানকার সমাজের এক ঘোর বিপদ উপস্থিত হয় এবং কেবল ডাঃ ম্যারাকটের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বলেই তা দূর হয়। সেই হল প্রভু ঘোরদর্শনের কথা, তাই দিয়েই আমার এই কাহিনী শেষ করব।

আগেই বলেছি শরণালয়টি সমুদ্রের নীচে যেখানে এসে পড়েছিল সেখান থেকে আসল শহরটির ধ্বংসাবশেষ বেশী দূরে নয়। পরে আরও অনেকবার সেখানে গেছি। সেখানকার বাড়িগুলির পাথর কুঁদে তৈরী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর, মস্ত মস্ত থাম মহাসাগরের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে অদ্ভুপ্রভার আলোয় নিথর নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেবল সামুদ্রিক আগাছার লতা পাতাগুলি আস্তে আস্তে দুলছে অন্তঃসাগরীয় স্রোতে। আর হয়ত কোন কোন বৃহৎকার মাছ যাচ্ছে আসছে সেই সব বিরাট বিরাট দরজার ভিতর দিয়ে। আমাদের বন্ধু মাণ্ডাকে নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুরাকালের সে অদ্ভুত স্থাপত্য নিদর্শন দেখে বেড়াতাম। দেখে দেখে মনে হয়েছিল নিছক বস্তুবাদের দিক দিকে, অর্থাৎ ভাল খাবারটি খাব ভাল বিছানায় শোব ভাল বাড়িতে থাকব যতরকম আরাম আছে তাই করব কেবল এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তাদের সভ্যতা আমাদের সভ্যতার চাইতে অনেক উন্নত ছিল। তারা মানুষের দৈহিক সুখ ও আরামের যত রকম ব্যবস্থা করতে পেরেছিল আমরা হয়ত এখনও তা পারিনি।

"কিন্তু কেবল দেহের আরামই তো নয়, অন্য দিক দিয়ে—যাকে বলা যায় তার আত্মিক দিক দিয়ে—আমরা যে তাদের চাইতে অনেক উঁচুতে তার প্রমাণ আমরা কিছুদিন পরেই পেয়েছিলাম। তখন বুঝেছিলাম যে এত বড় সভ্যতার পতনের কারণ কি। কেবল আমি একা নয়, সকলেই সুখী হোক, সকলেরই ভাল হোক—মানুষের ভিতরকার এই ভাবটা যখন তার বুদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না তখনই সভ্যতার সব চাইতে বড় বিপদ। এ বিষয়ে সাবধান না হলে একদিন আমাদের সভ্যতারও পতন হতে পারে।

সেই প্রাচীন শহরের একদিকে একটি প্রকাণ্ড ইমারত। হয়ত এককালে সেটা ছিল কোনো পাহাড়ের চূড়ায়, আমরা দেখলাম সেটা অন্যান্য বাড়ির চাইতে অনেকখানি উঁচুতে। কালো মার্বেল পাথরের চওড়া সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। সেই ইমারতটিও বেশীর ভাগ কালো মারবেলেই তৈরী, কিন্তু এখন তার সারাটা গা হলদে রঙের ছাতায় ঢাকা পড়েছে! দেউড়িটাও কালো পাথরের, উপরে মেডুসার (Medusa) মাথার মত একটি মাথা

আর তার চার দিকে ফণা-তোলা সাপ—সবই সেই পাথরে কোঁদা। দেওয়ালের গায়েও এখানে ওখানে সেই প্রতীকই আঁকা রয়েছে। আমরা মাঝে মাঝে সেই ইমারতের ভিতরে কি আছে দেখতে চাইতাম, কিন্তু মাণ্ডা মহা ব্যস্ত হয়ে উঠে কেবল ইসারা করতেন ফিরে যাবার। এমনি করে' ক্রমশঃ আমাদের কৌতূহল এতই বেড়ে গেল যে শেষে স্ক্যান্‌ল্যান্ আর আমি একদিন পরামর্শ করলাম যে আমরা নিজেরাই একদিন গিয়ে তার ভিতরে ঢুকে দেখে আসব সেখানে এমন কি আছে যার জন্য মাণ্ডা অত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এমন সময়ে ডাঃ ম্যারাকটই এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি বললাম, 'আপনার কি এতে কোনো আপত্তি আছে, সার্? আপনিও হয়তো আমাদের সঙ্গে গিয়ে ঐ কৃষ্ণমর্মর প্রাসাদের রহস্য ভেদ করতে ইচ্ছুক আছেন?'

"তিনি বললেন, 'ওটা কৃষ্ণ মায়ার প্রাসাদও হতে পারে। তুমি কখনও প্রভু ঘোরদর্শনের কথা শুনেছ?'

"শুনিনি বলাতে তিনি বললেন, 'আটলান্টিসের কথা আমরা যা কিছু জানতে পারি তা ইজিপ্টের মারফতে। ইজিপ্টের দেবতা স্যাইসের মন্দিরের পুরোহিতরা যেটুকু জানতেন তারই সঙ্গে লোকের কল্পনা মিলে মিশে ক্রমে এক কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছে।'

"স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'তা কি জ্ঞানগর্ভ বাণী দিয়েছিলেন সেই পুরোহিতরা?'

"তারা অনেক কিছুই বলেছিল, তার মধ্যে এই প্রভু ঘোরদর্শনের কথাও আছে। আমার কেবলই মনে হয় সেই প্রভু ঘোরদর্শনই হয়ত বা ঐ কৃষ্ণমর্মর প্রাসাদের মালিক।'

"স্ক্যানল্যান শুধোলে, 'তিনি কোন ধাঁচের চিজ্?'

"তার সম্বন্ধে যা কিছু জানা যায় তাতে এই কেবল মনে হয় যে তার ক্ষমতাও যেমন দৌরাত্ম্যও তেমনি, দুইই এত বেশী যে মানুষের পক্ষে ততটা সম্ভব নয়। নিজে তো সে চূড়ান্ত মন্দ ছিলই, দেশের লোকেদেরও মন্দ করে' তোলাই যেন ছিল তার ব্রত। শেষটা ভগবান্ যেন চাইলেন সমস্ত মুছে ফেলে আবার নতুন করে' সুরু করতে আর সেই জন্যই যেন সমস্ত দেশটাই ধ্বংস হয়ে গেল। এই হল মোটামুটি প্রভু ঘোরদর্শনের কিংবদন্তী। তার মন্দ প্রভাব থেকে আটলান্টিসের সেই মহাপুরুষ যাদের বাঁচাতে পেরেছিলেন তারা অবশ্য রক্ষা পেয়েছিল এই শরণালয়ে আশ্রয় পেয়ে। তাদের বংশধরেরা তো প্রভু ঘোরদর্শনের আস্থানকে ভয় করবেই।'

'আমি বলে' উঠলাম, 'আর তাইতেই সেখানে ঢোকবার জন্য আমি আরো অস্থির হয়ে পড়েছি।'

'বিল্ বললে, 'আমারও ঠিক তাই হে ইয়ার।'

'প্রফেসর বললেন, 'তাহলে বলি, বাড়িটা ভাল করে' দেখবার ইচ্ছা আমারও আছে। আমাদের এখানকার বন্ধুরা আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক না হলেও আমরা নিজেরাই যদি যাই তাতে তাঁদের কোনো অনিষ্ট হবে বলে' আমার মনে হয় না। সুযোগ পেলেই আমরা যাব।'

সুযোগ আসতে কিছুদিন লাগল। একবার এক পর্ব উপলক্ষ্যে সেখানকার সকলেই ব্যস্ত রইল। প্রবেশ দ্বারের কাছে বিরাট পাম্পগুলির হেপাজতে দুজন লোক মাত্র ছিল, তাদের বুঝিয়ে বললাম আমরা একটু বাইরে বেড়াতে যেতে চাই। জল ঠেলে চলতে চলতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেই রহস্যময় প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছালাম। এবার আর ঢুকতে বাধা দেবার কেউ নেই। আমরা স্বচ্ছন্দে কালো মারবেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে সেই বিরাট দেউড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

',দেখলাম সেই প্রাচীন সহরের অন্যান্য বাড়িগুলির চাইতে এই ইমারতটি অনেক ভাল অবস্থায় আছে। তার পাথরের পাঁচীল আর ঘরগুলোর বলতে গেলে কোন ক্ষতিই হয়নি, কেবল সমস্ত আসবাবপত্র অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার জায়গায় প্রকৃতি তাঁর নিজের হাতের তৈরী জিনিস দিয়ে ঘর সাজিয়েছিলেন, যদিও

সে সব দেখতে বড়ই ভয়ঙ্কর। একেই তো জায়গাটি অন্ধকার, তার উপর সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক পাওয়ালা বিকটদর্শন জীব আর যত কিম্ভূত চেহারার মাছ। বিশেষ করে আমার মনে পড়ে একরকম প্রকাণ্ড নীলচে লাল রঙের শামুক, কিন্তু তার খোলা নেই। সেগুলি সর্বত্র হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া একরকম বড় বড় কালো চ্যাপ্টা মাছ যা ঘরের মেঝের উপর মাদুরের মত বিছিয়ে পড়ে' ছিল। তাদের শুঁয়োর ডগায় যেন আগুনের শিখা কাঁপছে। সারা বাড়িটাই এমনি সব উদ্ভট জীবে ভরা।

"কিন্তু কি কারুকার্য! ঘরগুলির বাইরে, ভিতরে, বারান্দায়, সব জায়গায়। বাড়ির ঠিক মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড জমকালো ঘর। আমাদের টর্চের আলোয় দেওয়ালের কারুকার্য দেখলাম, কত রকম মূর্তি আর নকশা। শিল্পকলার দিক দিয়ে বলতেই হয় সেগুলি সবই অপূর্ব সুন্দর, তারচেয়ে বেশী সুন্দর হয়ত মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু সেগুলির মধ্যে এমন একটা নিষ্ঠুর ভাব যা মানুষের অযোগ্য। শয়তানের পূজার মন্দির যদি কোথাও থাকে তবে সে এই। তারপর এগিয়ে যেতে যেতে ক্রমশঃ দেখলাম ঘরের এক প্রান্তে এক ধাতুর তৈরী চাঁদোয়া, হয়ত সোনারই। তার নীচে লাল মারবেলের সিংহাসনের উপর বসে' এক ভয়ঙ্কর চেহারার দেবতা যেন অ-শিব। শরণালয়ের এক জায়গায় যে বেঅ্যালের মূর্তি দেখেছিলাম এও সেই ধরণেরই, কিন্তু আরো অনেক গুণ বেশী উদ্ভট আর ভয়ানক। কিন্তু তার সেই ভীষণ মুখে মন্দ ভাবের সঙ্গে এমন এক শক্তির ভাব ছিল যার দিকে একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায়না। আমাদের হাতের আলোটা পড়েছিল সেই মুখের উপর, আমরা তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় আমাদের পিছন থেকে কে যেন হাহা করে' বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল।

"আমাদের কাঁচের পোষাকের ভিতর থেকে কথা বললে তা যেমন কারও শোনবার উপায় ছিলনা তেমনি বাইরে থেকে কারও গলার আওয়াজও তার ভিতরে আসবার উপায় ছিলনা। তাছাড়া জলের মধ্যে হাসবেই বা কি করে? আশ্চর্য হয়ে পিছন ফিরে আমরা যা দেখলাম তাতে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

"ঘরের একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ—হ্যাঁ মানুষই বলতে হবে, কিন্তু মানুষ যে এমন হতে পারে তা কখনও ভাবিনি। মানুষ এই গভীর সমুদ্রের তলায় কোনও যন্ত্রের সাহায্য বিনা স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, শুধু তাই নয় কথাও বলছে, তার কথা আমাদের কানেও স্পষ্ট এসে পৌঁছাচ্ছে এসব দেখেই বুঝতে পারলাম যে আমাদের থেকে একেবারে আলাদা। দেখতে সে অসাধারণ সুপুরুষ। লম্বায় সাত ফুটের কম হবে না, অতি সুঠাম গড়ন, গায়ে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মত আঁটো পোষাক, মনে হল সেটা কোনো চকচকে কালো চামড়ার তৈরী ব্রঞ্জের তৈরী মূর্তির মত মুখ, মানুষের মুখে কতখানি শক্তির আর তার সঙ্গে মন্দের ভাব ফোটানো যেতে পারে তাই দেখাবার জন্য যেন কোনো মহাশিল্পী সেই মূর্তি গড়েছে। যেন ঈগলের ঠোঁটের মত ধারালো নাক, কালো কুচকুচে দুই জবরদস্ত ভুরু, ঘনকালো চোখদুটো যেন ছাই চাপা আগুন, থেকে থেকে ঝলকে জ্বলে উঠছে। সেই চোখের চাউনিতে ফুটে বেরুচ্ছে মানুষের মন্দ করবার অহেতুক ইচ্ছা আর নিছক নিষ্ঠুরতার আনন্দ। পাতলা কিন্তু নির্মম ঋজু দুই ঠোঁট, যেন মুখের মাংসের উপর একটা গভীর কাটা দাগ শুধু। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই ঠোঁটের দিকে তাকালে মনে ত্রাস লাগে।

"যেন আমরা সবাই উপরকার পৃথিবীতেই রয়েছি এমনি সহজে, এমনি পরিষ্কার গলায় চমৎকার ইংরাজীতে সে বললে, 'মহাশয়রা, এর মধ্যে তোমরা অনেক নতুন জিনিস দেখেছ, জেনেছ; পরে হয়ত আরো জানবে। অবশ্য তোমাদের সব দেখা সব জানায় হঠাৎ দাঁড়ি টেনে দেওয়ার প্রীতিকর কাজটাও আমায় করতে হতে পারে। আপাততঃ আমাদের আলাপটা এক তরফাই হচ্ছে হয়ত, তবে তোমাদের মনের প্রত্যেকটি কথাই আমি ঠিকঠিক

টের পাই, কাজেই বিশেষ অসুবিধা হবেনা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তোমরা অনেক শিখলেও এখনও তোমাদের কিছু শেখবার আছে।'

"আমরা হতভম্ব হয়ে এ ওর দিকে চাইতে লাগলাম। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল জানতে এ ব্যাপারে কার কিরকম মনে হচ্ছে। আবার সেই বিদ্রূপভরা গলার হাসি জানতে পেলাম—

"ইচ্ছে তো হবেই। তা ফিরে গিয়ে তো কথাবার্তা বলতে পারবে। আমার ইচ্ছা তোমরা ফিরে যাও। তবে তার আগে তোমাদের কয়েকটি কথা বলতে চাই। ডাঃ ম্যারাকট্, তুমি এদের মধ্যে বড়, তোমাকেই বলি। আমি কে তা অবশ্য তোমরা জান। আমার সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে বা ভাবতে গেলেই আমি তা জানতে পারি। আর আমার এই গরীবখানায় দয়া করে' কেউ পা দিলেই আমায় তার কাছে এসে দেখা দিতে হয়। এই জন্যই ওখানকার ঐ বেচারারা এ জায়গাটা এড়িয়েই চলে আর চেয়েছিল যে তোমরাও এড়িয়ে চল। তোমরা তাদের কথা শুনে চললেই ভাল করতে।

"আমাকে তোমাদের একটা হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছে, তোমাদের পৃথিবীর এক রতি বিজ্ঞান সম্বল করে' তোমরা তাই নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছ। আমি 'বিনা অক্সিজেনে বেঁচে আছি কেমন করে'? তোমাদের মধ্যেও কোনোকোনো লোক বিনা বাতাসে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। সমাধিস্থ অবস্থায় কেউ কেউ নিঃশ্বাস না নিয়ে দিনের পর দিন থাকে। আমি তাদেরই মত, তবে আমি সজ্ঞান ও সক্রিয় অবস্থাতেই থাকি।'

"এইবার তোমরা ভেবে সারা হচ্ছ যে আমার কথা তোমাদের কানে যাচ্ছে কেমন করে'। বৈদ্যুতিক ঢেউকে বাতাসের ঢেউয়ে পরিবর্তিত করাই তো বেতারের গোড়াকার কথা। আমি কথাগুলিকে বৈদ্যুতিক উচ্চারণ থেকে বায়বীয় শব্দে পরিবর্তিত করছি আর সেই শব্দ তোমাদের ঐ মুখোশের ভিতরকার হাওয়া দিয়ে তোমাদের কানে গিয়ে ঢুকছে।

"আর আমার ইংরাজী? আশা করি মন্দ ইংরাজী বলিনা। তা পৃথিবীতে থাকলাম তো কিছু দিন। কত দিন হবে? এগার হাজার বছর চলছে, না বারো হাজার হল? বোধ হয় বারো হাজারই। মানুষের সব ভাষা শেখবারই সময় পেয়েছি আমি। অন্যান্য ভাষার চাইতে ইংরাজী যে বেশী ভাল বলি তা নয়।

"আচ্ছা এবার দরকারী কথা বলি শোন। আমি বেঅ্যাল-সীপা। আমি প্রভু ঘোরদর্শন। আমিই সেই, যে প্রকৃতির রহস্য এতদূর ভেদ করেছে যে মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে পারে। এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে আমি ইচ্ছে করলেও আর মরতে পারবনা। যদি আমায় কখনও মরতে হয় তাহলে আমার ইচ্ছাশক্তির চাইতে আরও বলবান্ কোন ইচ্ছাশক্তির দরকার হবে। এদিক দিয়ে তোমরা বরং ভালই আছ। মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর মনে হতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবন অনেক গুণ বেশি ভয়ঙ্কর। তোমরা চিরকাল আমায় পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছ, আমি যেন পথের পাশে পড়েই আছি। এমনি করেই তো গোটা মানুষ জাতটার উপর আমার মন বিষিয়ে গেছে, এখন আমি পারলেই তাদের অনিষ্ট করি। কেমন করে' করি? যেখানে মন্দ যেখানে অন্যায় ইচ্ছা, সেখানেই মানুষের মন আমার এক্তিয়ারে, তখন আমি যেমন খুশি তাকে চালাই। হুনরা যখন অর্ধেক ইউরোপ ছারেখারে দিল আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। সারাসেনরা যখন ধনের নামে অন্য ধর্মের লোকেদের তলোয়ারের ঘায়ে কোতল করল আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। এমনি আরো কত! সমুদ্রের তলাকার এই ইঁদুরদের কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম। দেখছি অনেক দিনই থেকে গেল, আর না থাকলেও চলে। যার ক্ষমতায় এরা আজ এখানে এসে রয়েছে সে বেঁচে থাকতে আমায় তুচ্ছ করেছিল। যে বিপর্যয়ে তাদের দেশ ধ্বংস হল তার থেকে এদের বাঁচাবার উপায় সেই করেছিল। তার বুদ্ধির জোরে এরা রক্ষা পেল, আর আমার আপন ক্ষমতার জোরে আমি রক্ষা

পেলাম। এখন এদের জীবন-নাট্যে যবনিকা টেনে দেব মনে করছি।'

জামার ভিতর থেকে একটুকরো লেখা বার করে সে বললে, এইটি নিয়ে গিয়ে কলের ইঁদুরদের সর্দারকে দিও। বড় দুঃখের কথা যে তোমরা কয়জন ভদ্রলোকও ওদের সঙ্গে একই অদৃষ্টের ভাগী হবে, তবে তোমরাই যখন এদের এই দুরদৃষ্টের কারণ তখন এটা একরকম উচিতও বটে। পরে আবার দেখা হবে। ততদিন তোমরা এই সব ছবি আর অন্যান্য কারুকার্যগুলি ভাল করে দেখে নাও। তোমরা এগুলিকে যাই মনে কর আমি এগুলি করিয়ে অনেক আনন্দ পেয়েছি, আমার মনে কোনো খেদ নেই। সে সব দিন যদি ফিরে পেতাম তাহলে আবার তাই করতাম, আরো বেশী করে করতাম—কেবল এই মারাত্মক অনন্ত জীবন লাভের চেষ্টাটা আর করতাম না। ও আজ আর যাই হোক এই অমরতা লাভের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল। সে এখনও পৃথিবীতে আসে বটে কিন্তু সে একটা অশরীরী আত্মা হিসাবে, দেহধারী মানুষ হিসাবে নয়। আচ্ছা, আসি এখন।

'তারপর আমাদের চোখের সামনেই সে মিলিয়ে গেল! যে থামটিতে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল সেটা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। তার শরীরের ধারগুলো ঝাপসা হয়ে এল। চোখ দুটো যেন নিবে এল। তার পরেই দেখলাম সে নেই, শুধু খানিকটা কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠে যাচ্ছে। আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে' ভাবতে লাগলাম জীবনের কত বিচিত্র প্রকাশই না সম্ভব। ক্রমশঃ

সর্বনাশ

অশোক চক্রবর্তী

কয়লা-ধোয়া সেই নিশীথে
জ্যাব্‌ড়া-কালো একটা কিরে
একলা ছাদে হন্‌হনিয়ে
করছে দেখি পায়চারি রে।
ঘাবড়ে গেলাম (ভয়ই পেলাম)—
মানুষ না ও কোন জানোয়ার ?
ঠিক তখনি 'হালুম্' রবে
লাফিয়ে হল ছাদটি পার !

আঁৎকে উঠে সিঁড়ির মুখে
ছিট্‌কে পাশে যাই স'রে ;
আর কোথা যায় সামনে সিঁড়ি—
পড়ল বাছা গড়গড়ে'।
অনেকক্ষণ আর চোখ মেলিনি
লাগল এমন ভীষণ ভয়।
হঠাৎ শুনি গোঙরানি···হায়,
সেজ্‌দা ওযে—জন্তু নয়!!

এল. বি. ডব্লু

প্রসাদরঞ্জন রায়

(বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

'না, আর নয়। এবার খৃস্ট্‌মাসে কলকাতার বাইরে এমন কোথাও যেতে হ'বে যেখানে খেলাধূলোর ঝামেলা নেই। পড়াশুনো করা দরকার।'—ব্যাটটা ঘরের কোণে রাখতে রাখতে বললো শঙ্কর ব্যানার্জী, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের একজন সেরা ব্যাটসম্যান। 'সে কি রে। তুই এ বছরে তিনটে সেঞ্চুরী করেছিস—এর মধ্যেই বৈরাগ্য এসে গেল?' উত্তর দিল তার প্রাণের বন্ধু ও হস্টেলের রুমমেট সুদীপ্ত চন্দ। 'বৈরাগ্য না রে। স্কলারশিপ একটা আমার পাওয়া দরকার আর তার জন্য যা পড়াশুনো দরকার কলকাতায় হৈ চৈ'এ তা হবে না। কাজেই—' 'তবে যা, কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে মাথা গোঁজ গিয়ে' অপ্রসন্ন মুখে সুদীপ্ত ঘর ছাড়ল!

মুখে রাগ করলেও হপ্তাদুই পরে খৃস্টমাসের ছুটিতে শেষ পর্যন্ত সুদীপ্তই শঙ্করের সঙ্গী হ'ল। শুধু তাই নয়—জায়গাটাও ঠিক করল সে। তার এক পিসীমা থাকেন রাণীপুরে। তাঁর হপ্তাদুইয়ের জন্য সুদীপ্তদের বাড়ী বোম্বাই'এ যাবার কথা কিন্তু বাড়ী ফাঁকা রেখে যেতে পারছেন না। রাণীপুর আসানসোলেরই কাছাকাছি। সুদীপ্ত'র মতে অজ পাড়াগাঁ। অতএব বিনা দ্বিধায় দুই বন্ধু রওনা দিল। পিসীমাও খুসি মনে বোম্বাই পাড়ি দিলেন।

ওদের ভুল ভাঙ্গতে বেশী দেরী হল না। স্টেশনে নেমে এদিক ওদিক দেখেই শঙ্করের চক্ষুস্থির! দিব্যি পাকা রাস্তা, দোতলা বাড়ি, দোকানপাট, স্কুল, হাসপাতাল—রীতিমত শহর! সুদীপ্তও অবাক! সে শেষ আসে বছর সাতেক আগে। এর মধ্যেই গ্রামটা একেবারে শহর না হোক রীতিমত টাউনশিপে

পরিণত হয়েছে। 'যাই হোক, কলকাতার মতন ক্রিকেটের হুজুগ নেই ওদের নিশ্চয়' বলল শঙ্কর। সুদীপ্ত সায় দিল আর দুজনে পা চালাল পিসিমার বাড়ির উদ্দেশ্যে।

বাড়িটা কাছেই। কিন্তু তার আগেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। মিনিট পাঁচেক হাঁটতেই কানে এল স্পষ্ট ব্যাটে বল লাগার খটাখট শব্দ। হতাশ মুখে শঙ্কর তাকাল সুদীপ্তর দিকে। সুদীপ্ত সবে বলতে যাবে যে ছোট ছেলেরা খেলছে বোধহয় এমন সময় বাঁদিকের পাঁচীলের উপর দিয়ে একটা ক্রিকেট বল যেন উড়ে এল। কাঁচাপাকা গোঁফদাড়িওলা একটি মুখও উঁকি দিল। এক লাফে বলটা ধরেই ফেরত পাঠিয়ে নিয়ে সুদীপ্ত বলে ওঠে 'হাউজ্ দ্যাট।' গোঁফওলা ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললেন 'শুনুন, আপনারা কি ক্রি—'। কথা শেষ হবার আগেই শঙ্কর সুদীপ্তর হাত ধরে দে চম্পট।

দিনকয়েক পরে। সন্ধ্যাবেলা রাণীপুরের ডাক্তারখানায় সাত আটজন বসে আছেন। সকলেরই মুখ গম্ভীর। ব্যাপার ভয়ানক সিরিয়াস্। মাত্র দিনতিনেক পরেই রাণীপুর অ্যাথলেটিক ইউনিয়নের ক্রিকেট ম্যাচ—পাশের গ্রাম থুড়ি টাউনশিপ লক্ষ্মীপুরের সি. সি. এল. (ক্রিকেট ক্লাব অব লক্ষ্মীপুর)'-এর সঙ্গে। এই দুই গ্রাম বা শহরতলীর মধ্যে রেষারেষি দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রায় সব বিষয়েই। একের দেখাদেখি অন্যটিতে স্কুল, হাঁসপাতাল সবই হয়েছে। গত বছর পাঁচেক ধ'রে ক্রিকেট ম্যাচটি চালু হয়েছে। শুধু ছেলেছোকরা নয়, বয়স্ক লোকেরাও উৎসাহ দেন ও খেলেনও। আপাততঃ সমূহ বিপদ! —রাণীপুর গতবছর জিতেছিল, এক চোর ধরতে ডান হাতটি ভেঙ্গে বিরস মুখে ডাক্তারবাবু বিনয়বাবু আর অসিতবাবু কাঁচা পাকা দাড়িগোঁফ তাই আলোচনা করছিলেন। অসিতবাবুর লোহার ব্যবসা আছে। ক্লাবের ব্যাট, বল, প্যাড তিনিই কিনে দিয়েছেন। ক্যাপটেনও তিনি। গোমড়ামুখে তিনি বলছিলেন যে খেলাটা পিছিয়ে দেবার কোনো উপায়ই নিই। হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল শিবনাথ, হাইস্কুলের ছাত্র 'শুনেছেন ডাক্তারবাবু, লক্ষ্মীপুর এক সায়েব এনেছে!' সবাই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। প্রকাশ পেল যে হ্যারী ইভান্স ব'লে এক অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সাহেবকে ওরা কলকাতা থেকে আনিয়েছে। সে নাকি ক্যালকাটা ক্লাবে খেলত—ভারী ব্যাটসম্যান। সবাই বিমর্ষ হ'য়ে পড়ল। একে লক্ষ্মীপুরের 'ছোনে' দত্ত'র মত ফাস্ট্ বোলার রয়েছে তায় আবার ইভান্স! এদিকে শেখর বাবুর হাত ভাঙ্গা!

ডাক্তারবাবু বললেন 'কেউ বেড়াতে টেড়াতে আসেনি যে খেলতে পারে? অসিতবাবু বললেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ! ধরেছেন ঠিক। সেদিন দুটি ছেলে এসেছে নিকুঞ্জবাবুর বাড়িতে। তারই মধ্যে একজন একটা বল লুফেছিল। কি লোফার কায়দা আর কি তার স্বাস্থ্য! দেখেই মনে হয় ভালো প্লেয়ার। অন্যটি অবশ্য হাড়গিলে-টাইপ।' পোস্টমাস্টারমশায় বললেন, 'হ্যাঁ, সেদিন একটা চিঠি পোস্ট করে গেল, নাম দেখলাম শঙ্কর ব্যানার্জী। ক্রিকেট-টিকেটও কিসব লিখেছিল ছোকরা।' ডাক্তারবাবু লাফিয়ে উঠলেন, 'ইউরেকা! শঙ্কর ব্যানার্জী তো এবছর ইউনিভার্সিটি আর স্পোর্টিং ইউনিয়ন এ খেলছে! ভাল ব্যাটসম্যান।' তিনি কলকাতার ক্রিকেটের খোঁজখবর রাখতেন।

তখনই ডাক্তারবাবু, অসিতবাবু আর শিবনাথ রওনা হ'লেন ওদের বাড়ির দিকে। বাড়িতে

ঢুকেই দেখলেন গেঞ্জী আর সাদা হাফপ্যান্ট পরে একটি ছেলে মুগুর ভাঁজছে। কি তার স্বাস্থ্য! ডাক্তারবাবু বুঝলেন এমন চেহারা যার সে ভাল খেলোয়াড় না হ'য়েই যায় না। তিনি প্রথমেই বললেন 'আপনিই তো প্রেসিডেন্সি কলেজের শঙ্কর ব্যানার্জী? ক্রিকেট খেলেন?' ছেলেটির মুখে একটু দুষ্টু হাসি খেলে গেল। সে সম্মতি জানালে ডাক্তারবাবু তাকে ঘটনাটা খুলে বললেন। সেতো খেলতে তখনই রাজি, তবে বলল 'আমার এক বন্ধু আছে, বুঝলেন—সুদীপ্ত। খেলতে অবশ্য সে খুব ভালো পারে না কিন্তু তাকেও না নিলে আমি খেলব না।' এঁরা রাজী হ'লে সে পাশের ঘর থেকে রোগা, লম্বা, চশমা পরা, ভুরু কোঁচকানো একটি ছেলেকে ডেকে আনল। সে বহু গাঁইগুই ক'রে শেষে রাজি হল। ফেরার পথে অসিতবাবু বললেন, 'ও হাড়গিলেটিকে না নিলেই ভাল হ'ত। অবশ্য ঐ শঙ্করই সেঞ্চুরী-টেঞ্চুরী হাঁকড়াবে।'

যদিও সবাই বললেন যে কাউকে একথা বলা উচিত নয় তবু সবাই সবাইকে বললেন আর কথাটা উঠল লক্ষ্মীপুরের ক্যাপটেন সুনীলবাবু'র কাছে। তিনি মহা ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন আম্পায়ার গিরীনবাবুর বাড়ি। ২০৲ হস্তান্তর হল। গিরীনবাবু রাজি হ'লেন শঙ্করের পায়ে লাগলেই এল. বি. ডব্লু. দিতে।

অবশেষে খেলার দিন এল। টসে জিতে সুনীলবাবু ব্যাটিং নিলেন। একদিক থেকে বোলিং শুরু করল শিবনাথ। ওভার শেষ হ'তেই শঙ্কর বলল, 'আমি ফাস্ট বোলিং করতে পারি।' অসিতবাবুতো মহা খুসি, ডাক্তারবাবু খালি বিনয়বাবুকে বললেন, 'কি রকম খটকা লাগছে! শঙ্কর ব্যানার্জী বোলিং করে ব'লে তো শুনি নি।' যাই হোক শঙ্কর বোলিং শুরু করল বেশ জোরে। প্রথম ওভারেই দু দুজন বোল্ড আউট। ডাক্তারবাবু মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'বোলিং 'এর কি ছিরি!' সুদীপ্ত একটু হাসল। বাকিরা নিশ্চয়ই বুঝল হিংসা! যাই হোক, শঙ্কর আর শিবনাথ দুজনেই একটা ক'রে উইকেট নিল। ৪ উইকেটে ৭ রান। ব্যাট করতে এলেন লম্বা দাড়িওয়ালা ইভান্স সাহেব। এসেই শঙ্করের বলে বাউণ্ডারী মারতে আরম্ভ করলেন। ৫টা বাউণ্ডারী মারার পর বোলিং বন্ধ করল। বিনয়বাবু বোলিং করতে এলেন। তিনি স্পিন বোলিং করেন কিন্তু ইভান্সের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। অন্যদিকে 'ছোনে দত্ত' শিবনাথ আর অসিতবাবুর বলে বেপরোয়া মারতে লাগল। দেখতে দেখতে ৫০, ১০০, ১৫০ রান উঠে গেল। সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়! হঠাৎ 'ছোনে' দত্ত একটা বল সজোরে মারলে বলটা স্কোয়ার লেগের ভুঁড়িতে লেগে উপরে উঠে যায়। ডীপ ফাইন লেগে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো সুদীপ্ত। হঠাৎ ছুটে এসে বলটা ধরে ফেলল। হাততালি পড়ল। বিনয়বাবু বললেন, 'ঝড়ে বক মরে—' ৬৫ রান ক'রে 'ছোনে' দত্ত আউট হ'লেন। তার একটু পরেই শিবনাথ হ্যারি ইভান্সকে রান আউট করে দিল ৯১ রানের মাথায়। অল্প পরেই ১৮৭ রানে সি. সি. এল. সকলে আউট হ'য়ে গেল। বাকী উইকেটগুলি বিনয়বাবুই পেলেন।

বিশ্রামের পর ডাক্তারবাবু আর পোস্টমাস্টারমশায় নামলেন ইনিংস শুরু করতে। ১ রান ক'রেই 'ছোনে' দত্তর বলে খুঁচিয়ে স্লিপে ক্যাচ দিলেন পোস্টমাস্টারমশায়। ইভান্স জাঁদরেল খেলোয়াড়—

লুফলেন ঠিক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছোনে দত্ত খেলার ভোল পাল্টে দিল। ৫ উইকেটে ২১ রান ডাক্তারবাবু ১০ ক'রে নট আউট। খেলতে নামল শঙ্কর। সবাই উৎসাহের সঙ্গে দেখতে থাকলেন। 'ছোনে' দ'ত্তর প্রথম বল—সজোরে বোলারের মাথার উপর দিয়ে ছয়। পরের বল আবার ছয়! তৃতীয় বলে বাউণ্ডারী; চতুর্থ বলেও!! সাবাস্ সাবাস্—এই না হ'লে প্লেয়ার। ডাক্তারবাবু মনে মনে বললেন, 'আনাড়ী!' অসিতবাবু বুঝলেন জাত খেলোয়াড়। কিন্তু পরের ওভারে, একটা বল লাগল শঙ্করের প্যাডে। 'হাউজ্ দ্যাট্?'—লাফিয়ে উঠলেন সুনীলবাবু। আম্পায়ার গিরীনবাবু আঙ্গুল তুলে দিলেন। ৩৪ রান ক'রে আউট হ'ল শঙ্কর—এল. বি. ডব্লু.। দেখতে দেখতে ৮টা উইকেট পড়ল।

খেলতে এল সুদীপ্ত। 'ছোনে' দত্ত হেসেই বাঁচেনা—'এ হাড়গিলেটা কি খেলবে হে!!!' প্রথম বলটা হ'ল আস্তে, সুদীপ্ত সেটাকে আস্তে বাউণ্ডারীতে পাঠাল। পরেরটা এল একটু জোরে—সেটা বাউণ্ডারীতেও গেল একটু জোরে। তৃতীয় বল রীতিমত জোরে—সজোরে কাট করে সেটাকে ডীপ থার্ডম্যান বাউণ্ডারীতে পাঠাল সুদীপ্ত। ডাক্তারবাবুর মুখ হাঁ হ'য়ে গেল। অসিতবাবু ঠিক বুঝলেন, 'Fluke!' কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন ডাক্তারবাবু ২২ ক'রে আউট হ'লেন, তখন সুদীপ্ত'র রান ৫৬—মোট ৯ উইকেটে ১২৫। ব্যাট করতে এল শিবনাথ। সে দাঁত কামড়ে উইকেট আঁকড়ে রইল। রান করছিল সুদীপ্ত।

অস্থির হ'য়ে সুনীলবাবু গিরীনবাবুকে বললেন 'আরেকটা এল. বি. ডব্লু! চটপট!!' গিরীনবাবু বললেন, 'প্যাডে বলই লাগছে না!' 'তবে আর কিছু আউট দিয়ে দাও।' 'আর কুড়িটা টাকা স্যার?' —গিরীনবাবুর উত্তর। 'সে পরে পাবে।' বলেন সুনীলবাবু। 'আউটও পরে হবে' গিরীনবাবুর সোজা জবাব। হতাশ হ'য়ে সুনীলবাবু ফিরে এলেন। 'লাস্ট ওভার' গিরীনবাবু হেঁকে বললেন। তৃতীয় বলে চার—সুদীপ্ত'র সেঞ্চুরী হ'ল। পঞ্চম বলে চার, শেষ বলে ছয়। রানীপুর জিতে গেল—৯ উইকেটে ১৯০—সুদীপ্ত ১১৩ নট আউট, শিবনাথ ৮ নট আউট।

খেলা শেষ হ'তেই ডাক্তারবাবু ছুটে এসে বললেন, 'এর মানে কি?' সুদীপ্ত আর শঙ্কর হেসে বলল, 'ঠাট্টা! নেহাৎ হার্মলেস ঠাট্টা!!' ওদিক থেকে অসিতবাবু এসে বললেন 'জানেন শঙ্করবাবু, ওরা ঘুষ দিয়ে আপনাকে এল. বি. ডব্লু. আউট করেছে'—তিনি রাগে কাঁপছিলেন। শুনে আসল শঙ্কর হেসেই অস্থির 'আরে মশাই মিড্ল্ স্টাম্পের উপর ফুল টস বল—সোজা পায়ে লেগেছে। নির্ঘাৎ আউট!' 'নারে—' ব'লে ও প্রতিবাদ করতে যেতেই বন্ধুকে থামিয়ে সে বলল আবার, 'থাম তো! ক্রিকেটের তুই বুঝিস কি?' অসিতবাবুর তো চক্ষুস্থির—হাড়গিলেটা বলে কি! ডাক্তারবাবু হেসে বলেন, 'এবারে শুনুন—যাঁকে আমরা সুদীপ্ত বলে জানতাম সেই শঙ্কর, আর শঙ্করই আসলে সুদীপ্ত।'

অসিতবাবু কোনমতে সামলে নিয়ে বললেন, 'তা আমি আগেই বুঝেছিলাম।' শঙ্কর সুদীপ্তকে বলল, 'তাড়াতাড়ি চল, পড়া আছে।' অসিতবাবু ভাবলেন, 'অ্যাঁ! ঐ হাড়গিলেটা—!'

শালতোড়া গ্রাম

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক দূরে শিপ্রা নদীর ধারে
আছে রে ভাই ছোট্ট সে এক গ্রাম
নীল চাঁদোয়া আকাশ যেথা রচে
মিষ্টি মধুর শালতোড়া তার নাম।
সেথায় আছে ছোট্ট রাখাল ছেলে
সবুজ মাঠে বেড়ায় হেসে খেলে
স্বপ্ন ফড়িং ঘাসের বুকে দোলে
বন উতরোল হাওয়ায় অবিরাম
শ্যামলা ছেলে বাজায় বাঁশি সুখে
চাঁদের আলোয় ঘুমায় ছোট গ্রাম।

রাখাল ছেলের দুচোখ ভরা আশা
হাওয়ায় শোনে মুক্ত প্রাণের গান
ঘাসের বুকে শিশির যখন ঝলে
খুসির নেশায় উথলে ওঠে প্রাণ।
বর্ষারাণীর নূপুর যখন বাজে
আকাশ ঘনায় নিথর-নিঝুম সাঁঝে
বিজলি হানে সজল মেঘের মাঝে
রাখাল ছেলের হৃদয়টা আনচান
বন-কুসুমের সুবাস আসে ঘরে
শ্যামলা ছেলে কণ্ঠে ধরে গান।

শিপ্রা নদীর শান্ত-অথৈ জলে
ঢেউয়ের সাথে আপনি করে খেলা
আবার কখন গাছের ছায়ে শুয়ে
পাতার কাঁপন শুনবে সারা বেলা,
রাঙা ধূলোয় বাতাস গেল বয়ে
ঘাসের ডগা পড়লো হঠাৎ নুয়ে
পাগল হাওয়া কোন কথা যায় কয়ে
রাখাল ছেলের হৃদয়ে দেয় দোলা
উদাস ঘুঘু বিভোর হয়ে ডাকে
আলোছায়ায় করল শুরু খেলা।

ছোট্ট সে গ্রাম হাতছানিতে ডাকে
শিপ্রা নদী ছন্দে আপন হারা
রাখাল ছেলে বাঁশীর মোহন সুরে
ছড়ায় সেথা সুরের সুধাধারা।
আকাশ-মাটি মিলন রাখী গড়ে
চাঁদের আলোয় আশিসধারা ঝরে
দখিন হাওয়া মনটি দেবে ভরে
ছন্দে গানে হবেই মাতোয়ারা
শালতোড়া গ্রাম সোনার স্বপন-ছবি
ঝর্ণা নামে যেথায় কলস্বরা।

ছোটদের জন্য
ছোট গল্প

লালির ছানা

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

লালির মনে ভারি দুঃখ। অন্য মুরগিদের অনেক ছানা হয়েছে,—কেমন গোল গড়ন, সরু ঠোঁট, ছোট ছোট পায়ে তুরতুর করে ছোটে। লালির মোটে একটা ছানা, তাও ধ্যাবড়া গড়ন, চ্যাপটা ঠোঁট, থ্যাবড়া পায়ে ল্যাগব্যাগ করে হাঁটে, সবাই হাসে, বলে—'ছ্যাঃ-ছ্যাঃ-ছ্যাঃ।'

সেদিন মুরগিরা সবাই বাইরে বেড়াতে গেল। সব ছানারা ঘাসে খেলা করছে, আর লালির ছানাটা সোজা গিয়ে পুকুরে নামল। লালি কত চেঁচাল, সে ফিরেও চাইল না, কচি ডানা ঝাপটিয়ে, থ্যাবড়া পায়ে জল ছিটিয়ে মনের আনন্দে স্নান করতে লাগল!

হঠাৎ 'প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক!'—পাশের বাড়ি থেকে একপাল ছানা নিয়ে দুটো হাঁস এসে জলে নামল। লালির ছানাও অমনি 'প্যাঁক-প্যাঁক' করে, সাঁতার কেটে চলল সেই দিকে—এমনি তাদের দলে মিশে গেল যে লালি চিনতেই পারল না কোনটা তার ছানা!

সাদি, কালি, লালি, হলদি, সবাই অবাক হয়ে বলল—'কঁক-কঁক-কঁক? এর মানে কি?'

এর মানে যে কি, তা শুধু ভজুয়া জানে। ভজুয়া দুই বাড়িতেই কাজ করে। সাদি, কালি বসে ডিমে তা দেয়, লালির ডিম নেই, তবু সে ওদের দেখাদেখি বসে থাকে, তাই ভজুয়া চুপিচুপি ও-বাড়ি থেকে একটা হাঁসের ডিম এনে লালির ঝুড়িতে রেখেছিল। ডিম ফুটে যখন ছানা বেরোল, লালি ভাবল ওটা তারই ছানা!

(১) জয়শ্রী তরাত, ২০৮৬, বয়স ১৩

মাঝে মাঝে হয়তো দেখে থাকবে বইয়ের গোড়ার পাতায় লেখা 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত'। তার মানে কি জান? তার মানে হল ঐ লেখার মালিক ছাড়া আর যে কেউ ছাপতে পারে না। তুমি যে-সব গানের কথা লিখেছ, তার মালিক তো আমরা নই, ভাই।

(২) উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৪৮১, বয়স ১২½

তোমরা খুসি হলে, আমরাও আরো খুসি হই। পুরস্কারের চেয়েও তোমাদের খুসিটা বড়। তোমার ছয় ঋতুর ছড়া ভালো হয়েছে, যদিও দু-এক জায়গায় ছন্দ ঠিক নেই। জায়গা পেলেই ছাপার ইচ্ছা আছে।

(৩) সুকন্যা সিংহ. ৪৯৩, বয়স ১১½

জান তো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন যা দেখা যায়, শোনা যায়, বেছে বেছে মনের মধ্যে জমা করে রাখতে হয়। কারণ ঐগুলোই হল সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। তাকে অবিশ্যি মনের রস দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়। দেখি সত্যিকার জীবনের ছোট ছোট ঘটনা লেখার কতদূর কি করতে পারি।

(৪) শ্রুবাবতী চক্রবর্তী, ২২০৪

বয়স দিতে হয় জান না বুঝি? সর্বদা দিও। 'ম্যারাকট ডীপ' ধারাবাহিকভাবে চলছে, তবু বলছ অনুবাদ ছাপা হয় না, এ কেমন কথা?

(৫) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭৩১, বয়স ৯ বছর

ভাই তোমার চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নি বলে আমি দুঃখিত। বোধ হয় হারিয়ে গেছে। যাই হোক, এবার দিচ্ছি। লেখা পাঠালে সর্বদা এক পিঠে নিজের হাতে কালি দিয়ে লিখবে। ড্রইং একটু মোটা কাগজে, একটু বড় কালি দিয়ে এঁকে পাঠাবে। দাগ কাটার দরকার নেই। মন থেকে ছবি এঁকো, কপি করে পাঠিও না। কেমন?

(৬) শান্তনু সেন, ৪১৮, বয়স ১৩

ভাই, ছবি তো ভালই আঁক মনে হচ্ছে, কিন্তু ওরকম কাগজের কুচিতে ওভাবে আঁকলে ব্লক তৈরি করা মুস্কিল। তার উপর কেমন যেন ধেবড়ে গেছে।

(৭) মনামীর পুরো নাম কি? গ্রাহক সংখ্যা কত? বয়স কত?

(৮) সুবীর অধিকারী, ১৪৫৬, বয়স?

বয়স না দিলে ভাই, কোনো লেখা বা ছবি ছাপা হয় না।

(৯) চৈতালি সান্যাল, ২৬১২, সর্বদা বয়স দেবে।

মহাশ্বেতার ধাঁধার উত্তর যতদূর মনে পড়ছে, মাছ ধরার জাল।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর।

ঘন বনের জ্ঞাতি

জীবন সর্দার

ছোটবেলায় আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল জাক্কু। দিনে একবার তার সাথে দেখা না হলে আমার ঘুম আসত না রাতে। সারা সকাল পড়াশুনা, দুপুরে ইস্কুল সেরে বিকেলে ঘরে এসে বই রেখেই ডাকতুম—জাক্কু। কোথাও না কোথাও থেকে সে সাড়া দিত: কু-উ-উ। তারপর ছাদ থেকে বা গাছ থেকে নেবে এসে কাঁধে চড়ে বসত। তার জন্য বাদাম বা কলা রাখতুম পকেটে! কোন পকেটে কি আছে, কেমন করে বার করে তা খেতে হবে, ছোট্ট হলেও, সে সব জানতো বুঝতো। বড় হয়ে সে কিছুটা বদলে গেল। কথা কম শুনতো। আঁচড়ে দিত, কামড়ে দিত যখন তখন। তাই একদিন, অবাদা, যিনি বাজার করতেন, জল তুলতেন আর জাক্কুর যত্ন করতেন, রেগে মেগে জাক্কুকে কোথায় পার করে দিয়ে এলেন।

তারও কিছুদিন পর আমি গ্রাম ছেড়ে নদী পেরিয়ে দেশ ঘুরতে যাই। যেখানেই গিয়েছি, জাক্কুকে খুঁজেছি। জাক্কুকে না পাই, জাককুর মত অনেকের দেখা পেয়েছি। জাক্কুর কথা বললেই অবাদা ভেউ ভেউ করে কাঁদতেন, আর বলতেন, 'তোরা বুঝবিনা, ও যে আমাদের জ্ঞাতি—আদি পুরুষের বংশধর, জ্ঞাতি হারালে কাঁদে না লোকে?' তার কথা শুনে হাসি পেত। আসামের জংগলে একবার 'জ্ঞাতিদের' হাঁকাহাঁকি শুনে আমার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল।

কাছাড়-পাহাড়ের ভেতর দিয়ে লামডিং থেকে বদরপুর যাবার রেলপথ। সকালের গাড়ীতে চেপেছিলাম দুপাশের ঘন বন আর পাহাড়ের সুড়ঙ্গ আর রেলপুলগুলি দেখব বলে। পথে কি কারণে জানিনা মৈবং এর কিছু আগে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। অনেকেই নেবেছিল, আমিও নাবলুম। গারডের কামরা ছাড়িয়ে পাহাড়ের বাঁকে ঝরণার ধারে আসতেই—মাথার উপর চারধার থেকে হাঁকাহাঁকি শুরু: উলুক-উলুক লুক। আমি হিম হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, যেন গাছ হয়ে গেছি। ওদের বুদ্ধি আমার চেয়ে বেশি। আমার দিক থেকে একবারও নজর ফেরাল না। লম্বা হাতে গাছের ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে দোল খেয়ে নিরাপদ জায়গায় বসে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কেউ। দু'একটি গাছ বেয়ে নেবে আসতেই তাদের দিকে মুখ করে আমি পিছু ছুটলাম। শাদা ভ্রু ওয়ালা 'উললুক' গুলো মাটিতে প্রায়

সোজা হয়ে চলে। দেহের তুলনায় হাতগুলো অনেক লম্বা, চলার সময় তার উপর ভর করে যতই এগিয়ে এলো আমি পেছতে পেছতে ততক্ষণে গাড়ির কাছে। জয় হয়েছিল তাদেরই। আনন্দে 'উলু' দিতে দিতে গাছের পাতা ছিঁড়ে মুখে পুরে বিজয় ভোজ শুরু করলো।

এমনি হঠাৎ মুখোমুখি হয়েছিলাম 'সিংহ লেজ বানরের' সাথে। গোয়া যাবার গাড়ি ধরব বলে খুব সকালে গোন্‌দা স্টেশনে নেবেছি। পুনা থেকে ট্রেনটি আসার দেরী ছিল। হাঁটতে হাঁটতে এমন একটি জায়গায় এসে পড়লাম যারপরই ঘন বন। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই গাছের উপর থেকে কচি বাঁদরের কান্না শুনতে পেলাম। আমাকে দেখে নয়, মায়ের কাছে কোন কিছুর আবদার করছে ছানাটি।

মায়ের নজর ছানার দিকে নয়, আমার দিকে। আমার নজর তার দিক থেকে গাছে গাছে। আরও কয়েকটি মা, তাদের বুকেও ছোট ছানা। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। বড় গাছের ঘন পাতায় আড়ালে হয়তো রাত কাটিয়ে এই বেলা বনে ফিরবে। এমনি সময়ে আমি গিয়ে হাজির—কথাগুলি ভাবছি আর দেখছি কোন পথে ফিরি।

ছানাটি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গাছ বেয়ে নেবে এলো খানিকটা, তার মা, যার মুখের চারপাশে বড় বড় লোম—যেমন থাকে সিংহের কেশর, আমার দিক থেকে নজর ফিরিয়ে নিলনা। সিংহের লেজের মতই তার লেজের ডগা—তুলির মত, লোমে ভরা।

হাত বাড়িয়ে সে বাচ্চাটাকে বুকে টেনে নিল। লেজটাকে তুলে পিঠের উপর সোজা করে একবার আমার দিকে ঝুঁকি দিয়ে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে ডাল থেকে ডাল ধরে বনের ভেতর চলে গেল। ভয়ে আমি প্রায় চোখ বুজে ফেলেছিলাম। সে চলে গেলেও আর কেউ গেল না। তারা মোট বার চোদ্দটি হবে বসে বসে গাছ থেকে পোকা মাকড় ধরে ধরে খাচ্ছিল। আমার দিকে নজরই নেই। আমিও যেন তাদের দেখিনি এমনি ভান করে যেমন ভাবে সেখানে গিয়ে পড়েছিলাম তেমনি আনমনে চলে এলাম।

যে ধরনের বাঁদরকে বহু খুঁজেও দেখতে পাইনি সেটা আসামের ছোট্ট অসুর। তারা রাতে চলাফেরা করে, যা পায় তাই খায়—পোকা মাকড় ফলমুল। দিনে তাদের দেখা পাওয়া মুশকিল। খুব ধীরে ধীরে ডালে ডালে চলে বলে শব্দ কম হয়। বোঝা যায় না গতিবিধি। বনে যারা কাঠ কাটতে বেত আনতে যায় তাদের একজন আমাকে বলেছিলেন, তিনি দেখেছেন ওদের কবজী সরু বটে কিন্তু হাতের পাণজা খুব চওড়া। গাছের ডালে বাচ্চা নিয়েও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। গাছের তলা থেকে তখন খরগোসের মুখের মত তার মুখটি দেখায়। রাত্রিবেলা চলাফেরা করে বলেই ঘন বনের এই জ্ঞাতিদের দেখা তাদের বাসায় কোনদিন পাইনি। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন বনে আসামের এই নিশাচর বাঁদরদের চেয়েও ছোট একজাতের নিশাচর বাঁদর রয়েছে। হাবভাব চলাফেরায় তাদের খুব মিল। আর তাই তাদের দেখা পাইনি।

দক্ষিণ-ভারতে হরদম চোখে পড়েছে 'টুপি মাথা' বাঁদরগুলোকে। উত্তর ভারতের তীর্থে তীর্থে

যেমন হনুমান, দক্ষিণের 'টুপিমাথা' গুলোও তেমনি মানুষকে কোন তোয়াক্কা করে না। পাহাড়ে বনে ক্ষেতে গ্রামে সবখানে দেখেছি ও গুলোকে। মাথার চুলগুলো এত বড় আর এমন করে থাকে দেখে মনে হয় মাথায় কিছু একটা ঢাকা দিয়ে রেখেছে। লেজটা কিন্তু বেজায় বড়। গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে হাত পা ছেড়ে দোল খাচ্ছে এমন একটা ছবি আমি দেখব বলে আশা করেছিলাম। দেখিনি।

আসামের ঘন পাহাড়ি বনের এক ধরনের হনুমানের খবর আমি পেয়েছি তাদের গায়ের লোম গরমকালে থাকে ঘিয়ের রং আর শীতে তা পালটে হয় সোনালী-লাল। খুব সুন্দর। কিন্তু যে যত সুন্দর হোক, যদিও জাকুকে খুঁজতে গিয়েই তাদের দেখা আমি পেয়েছি, তবুও জাকুর চেয়ে বেশি কাউকে আমি ভালবাসিনে।

প্রকৃতি-পড়ুয়াদের পরিবেশ

প্র প, অলকানন্দা চট্টোপাধ্যায় লিখেছে :—আমি থাকি পানিহাটীতে। পানিহাটী আধা শহর আধা গ্রাম। কারণ, শহরের অনেক সুযোগ সুবিধাই আমরা পাই আবার গ্রামের নির্জনতা আর সৌন্দর্যের অভাবও এখানে নেই। আমাদের বাড়ির উত্তরদিকে পুকুর, তার ধারে কলা, কল্কে প্রভৃতি নানারকমের গাছ। পূবদিকে এক বিরাট মাঠ—তার খানিকটা জংগলে ভর্তি। সেই মাঠে প্রচুর আমগাছ। দক্ষিণ দিকে ফুলের বাগান, তার পাশে রাস্তা। বাড়ির পশ্চিমদিকে বেল কল্কে আর কয়েকটা নাম না জানা বড় গাছ। আমাদের বাড়িতে সাত আটটা নারকেল গাছ আছে। প্রত্যেকটা গাছেই টিয়া আসে। চারদিকে গাছপালা থাকায় সবসময়ই আমরা নানারকম পাখি দেখতে পাই। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই গঙ্গা।

[অলকানন্দা, যে যে পাখির বিবরণ লিখেছ তা দপ্তরে পাঠাও। আরও দেখ, পাখিদের রং, তাদের ডাক, কি খায় আর কেমন করে ওড়ে। ডানা ঝাপটে না পাশে মেলে দিয়ে বাতাসে ভেসে থাকে ? জী. স.]

প্র. প. শুভময় আর কল্যাণময় চট্টোপাধ্যায় লিখেছে : আমাদের বাড়ির পাশে আছে একটি মাঠ, বর্ষাকালে সেটা পরিণত হয় একটি পুকুরে। তখন সেখানে মাছ ও ব্যাঙের মেলা বসে। সন্ধ্যে হলেই সেখান থেকে ছোট ছোট ব্যাং উঠে এসে আমাদের বাড়িতে ঢোকে। একদিন একটা বিরাট কালো ব্যাংও ঢুকে পড়েছিল। ওই মাঠ-পুকুরের মাছ আমি নিজের হাতে ধরে দেখিনি। পাড়ার ছেলেদের হাতে দেখে মনে হয়েছে ওগুলো ল্যাটা মাছ। উই পোকাগুলো আমাদের খুব কাছাকাছি থাকতে আসে। যেখানে সেখানে, বিশেষ করে দরজার মাথা থেকে তারা বাসা বানাতে শুরু করে দেয় সুযোগ পেলেই বাড়ির আনাচে কানাচে মাঠের মধ্যে অনেক রকম পোকামাকড় দেখতে পাই। পিঁপড়ে প্রভৃতিরও অভাব নেই।

[শুভময়, কল্যাণময়, তোমরা লিখতে ভুলে গিয়েছ জায়গাটির নাম—যার প্রাকৃতিক পরিবেশ জানিয়েছ। জী. স.]

প্র. প মিত্রা রায়চৌধুরী লিখেছ : আমাদের বাড়ির পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া একেবারেই প্রকৃতির মুক্ত আবহাওয়ার মত নয়। আমাদের বাড়ির চারপাশেই বাড়ি। তার ফাঁকে ফাঁকে আম, নিম, জামরুল পেয়ারা নারকেল এমনি কয়েক জাতের গাছ। বাড়িতে রয়েছে বিড়াল, টিয়া বদ্রিকা আর বিভিন্ন ধরনের মুনিয়া। একদিন আমাদের বাড়িতে একটা প্রজাপতি এসেছিল। প্রজাপতিটা প্রায় চারদিন একজায়গায় বসে ছিল। আমি জানতাম প্রজাপতি একদিনের বেশি বাঁচে না। তাহলে এটা কি করে এতদিন বাঁচলে? বিড়ালদের গা পরিষ্কার করার পদ্ধতিটা খুব মজার—লক্ষ্য করেছি। ওরা জলের কাছে যায় না, নিজেদের গা চেটে পরিষ্কার করে। মাথা চাটতে পারে না তাই হাতটা ভাল করে চেটে ভিজিয়ে নিয়ে মাথায় ঘষে, তাতেই মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়।

[মিতা, পরিবেশের কথায় বিশেষ একটা প্রাণীর কথা এনে ফেলেছ। বাড়ির পাখিগুলোর পরিষ্কার হবার পদ্ধতি কি লক্ষ্য করে জানাতে পারবে? জী. স.]

পাখি গোনা : সন্দেশ কার্যালয়ে 'প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালায়' প্রতি মাসের প্রথম রোববার যে পড়ুয়ারা আসে তাদের একটা কাজ 'পাখি গোনা'। পাখি গোনা মানে, একমাস ধরে যত জাতের পাখি সে দেখেছে তার তালিকা তৈরী করা। চড়ুই কাক চিল শালিক কিছুই বাদ যাবে না। পাখিটির কি নাম, কোথায় তাকে দেখলে, দিনের কোন্ সময়ে তাকে দেখলে, সেখানে পাখিটি কি করছিল—সব লিখতে হবে। যদি পাখিটার নাম জানা না থাকে তবে তার রং, তার স্বর, ঠোঁট পায়ের ডানার গড়ন সব লিখতে হবে। আমি ভাবছি শুধু প্র প পাঠশালার পড়ুয়ারাই এই কাজটা করতে পারে—কেননা, পাখি গোনা মানেইত' পাখি চেনার শুরু। তোমার তালিকাটা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম রোববারের আগেই প্র. প. দপ্তর, সন্দেশ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিও।

পুস্তক পরিচয়

কল্যাণী কার্লেকার

সেদিনকে—শ্রীমান উজ্জ্বল। নীরাঞ্জনা প্রকাশনী—৩৫ সি মতিলাল নেহরু রোড, কলকাতা ২৯। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

এখন যদি উজ্জ্বলকৃষ্ণ গোস্বামীর বয়স সাত বছর হয়, যদি বছর দেড়েকের সংগ্রহ এই আটপাতার ছোট্ট বইখানায় থেকে থাকে, তবে তার শুরু উজ্জ্বলের সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে। তরতরে, ঝরঝরে ভাষা। রচনার বিষয় ও ভাবে ওই বয়সের ছেলের মনটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বড়রা কি ভাববে জানি না, কিন্তু সমবয়সী ছোটরা নিশ্চয়ই আনন্দ পাবে।

আগাগোড়া বড় হরফে ছাপা বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় কেন ছোট হরফ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে? বইয়ের আয়তন আট পৃষ্ঠায় রাখবার জন্য?

খেলাধুলো

অজয় হোম

ক্রিকেট

সাহসীরাই একমাত্র ভাগ্যলক্ষ্মীকে বরণ করতে পারে— এই ধরনের কথা কেবল শুনেই এসেছি। সেটা প্রত্যক্ষ করলাম দিল্লীর ফিরোজশাহ কোটলা মাঠে। গোড়াপত্তন অবশ্য হয়েছিল দ্বিতীয় টেস্ট কানপুরের গ্রীন পার্কে। তোমাদের একটা কথা গত ডিসেম্বর সংখ্যায় বলেছি— ক্রিকেটে আত্মবিশ্বাস সাফল্যের এক বড়ো হাতিয়ার। সেই আত্মবিশ্বাস ভারত অর্জন করেছে কানপুরে। আর সাফল্যলাভ করেছে রাজধানী দিল্লীতে! ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্নমুখে হেসেছেন।

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের নির্বাচকমণ্ডলী প্রথম টেস্ট দল থেকে চারজন খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে সে জায়গায় যখন চারজন তরুণ খেলোয়াড়কে নেন তখন অনেকেই সেই নির্বাচন সমর্থন করেন নি, সমালোচনা করেছেন। 'সন্দেশে'-এর পাতায় সেই নির্বাচনকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। তার ফলে ভারত এমন একজন তরুণ খেলোয়াড় পেয়েছে যার তুলনা হয় না, যার খেলা মনে পড়িয়ে দেয় পুরোনো দিনের কথা, যার নাম— জি আর বিশ্বনাথ। একুশ বছরের ছেলে, মহীশূরে বাড়ি। আর আবিষ্কার করেছে একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান যে খেলেছে প্রথম টেস্টে ওয়ান ডাউন—অশোক মানকড়। একমাত্র তরুণ অশোক গানদোত্রাই কিছুই করতে পারে না।

দ্বিতীয় টেস্টে অশোক মানকড়ের মধ্যে পেয়েছি বিজয় মার্চেন্টের এবং বিশ্বনাথের মধ্যে দেখেছি হাজারের ছায়া। আর একনাথ সোলকারের মধ্যে নাদকার্নির। অবশ্য সোলকার মিডিয়ম পেসার কিন্তু ব্যাটিংএ নাদকার্নির মতো লেগে থাকা এবং পার্টনারকে সাহায্য করার যে সাহস, ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তা বিস্ময়কর।

তরুণ বিশ্বনাথ টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে পৃথিবীর ৩৪তম এবং ভারতের ষষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই সেঞ্চুরি করবার গৌরব অর্জন করেছেন। শুধু গৌরব অর্জন নয় অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের বিষ দাঁত ভেঙে দিয়ে যেভাবে বাউণ্ডারির পর বাউণ্ডারি মেরে করেছেন তা কল্পনাতীত। ২৬৮ মিনিটে ২৪টি বাউণ্ডারি সহ ১৩৭ রান। বিশ্বনাথের আগে ভারতের যে পাঁচজন টেস্ট খেলায় নেমেই সেঞ্চুরি করেছেন তাঁরা হলেন— লালা অমরনাথ, দীপক সোধন, এ জি কৃপাল সিং, আব্বাস আলি বেগ এবং হনুমন্ত সিং।

তোমরা জানো কি না জানি নে। কিন্তু এই গ্রীন পার্কে রিচি বেনোর দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়া দলকে ভারত ১১৯ রানে হারিয়েছিল। সেটাই ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম জয়। এবারে দ্বিতীয় টেস্ট্ কানপুরে জয়ী না হলেও ড্র করলেও তরুণ বিশ্বনাথের উজ্জ্বল ক্রিকেট আমাদের মনে বহু আশা এবং সুখস্মৃতির আমেজ এনে দিয়েছে। তারা এক-একটি বাউণ্ডারি রেডিও মারফৎ শুনেছি আর আনন্দে মন ভরে উঠেছে।

এই দ্বিতীয় টেস্টে ওপেনিং করতে এসে অশোক মানকড়ের চিত্তাকর্ষক খেলাও সকলের মন কেড়ে নেয়। ইনজিনিয়ার ও অশোক জুটি মাত্র ১১০ মিনিটে ২১১ রান করে। মার্চেন্ট, মুস্তাক আলির পর কোনো টেস্টে ভারত এত ভালো ওপেনিং করেছে কিনা সন্দেহ। রান অবশ্য বেশি হয়েছে। অশোকের বাবা ভিনুর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৮৮ একক কৃতিত্ব এবং পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যণ্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে ৪১৩ রানের জুটি ভোলবার নয়। কিন্তু এ যে সাক্ষাৎ যম! আর এত দ্রুত! অশোকের প্রথম ইনিংস ৬৪ ও দ্বিতীয়তে ৬৮ রান আগামী দিনের ওপেনিংএর ভিত্তি স্থাপন করল। একনাথ সোলকারের ৪৪ ও ৩৫ রান অনবদ্য। অস্ট্রেলিয়ার পল সিহানও এই টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরির অধিকারী হন। বাংলার সুব্রত গুহ পান জীবনের প্রথম টেস্ট উইকেট। সুব্রত মাত্র দুটি উইকেট পান, ক্যাচ মিস না হলে এবং পতৌদি তাঁকে বল করায় আরও বেশি সুযোগ দিলে হয় তো আরও উইকেট পেতে পারতেন।

তৃতীয় টেস্টে বিশ্বনাথের ব্যাট থেকে একটি বিশেষ রান হওয়ায় ভারত জেতে ৭ উইকেটে। তরুণের জয়গান ভারতের আকাশে বাতাসে আজ মুখর হয়ে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়ার আত্মবিশ্বাসে ঘা লেগেছে। প্রচণ্ডভাবে। বিল লরির উক্তি আজ মিথ্যা দম্ভ বলে ঠেকছে।

এই টেস্টে গনদোত্রার জায়গায় অম্বর রায়কে নেওয়া হয় কিন্তু সে আমাদের মুখ রক্ষা করতে পারে না। অশোক প্রথম ইনিংসে ওপেন করতে নেমে মাত্র ৩ রানের জন্যে সেঞ্চুরি থেকে বঞ্চিত হন। আর ওয়াদেকার দ্বিতীয় ইনিংসে ৯১ রাণে অপরাজিত থাকেন। ওয়াদেকারের এই রানটা করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, দেখছিলাম ওয়াদেকার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন।

বেদী আর প্রসন্নর বলে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা দুই ইনিংসেই মোটেই সুবিধে করতে পারেন না। অস্ট্রেলিয়ার পতন হয় মাত্র ২৯৬ এবং ১০৭ রাণে। বেদী ৯টি উইকেট ১০৮ এবং প্রসন্নও ৯টি উইকেট পান ১৫৩ রানে। সুতরাং বুঝতেই পারছ দুই বোলারের স্পিনের ছোবল কেমন হয়েছিল।

তার উপর এই টেস্টে প্রসন্ন একশ উইকেট পাবার কৃতিত্ব দেখান। ভারতীয়দের মধ্যে এর আগে টেস্টে শত উইকেট পেয়েছেন ভিনু মানকড় এবং এস পি গুপ্তে। প্রসন্নর এই কৃতিত্বকে সম্মান দেখিয়ে ভারত সরকার তাঁকে এবছর অর্জুন পুরস্কার দিলেন।

বিশ্বনাথ রান করে ২৯ এবং ৪৪ নট আউট। ভারত জয়ী হয় ২২৩ এবং ৩ উইকেটে ১৮১ রান করে।

তৃতীয় টেস্টের পর গৌহাটিতে পূর্বাঞ্চলের খেলা হল অম্বর রায়ের নেতৃত্বে। অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ইনিংসে বাগে পেয়েও ক্যাচ ও স্টাম্পিং মিস করার জন্যে খেলা হাত থেকে বেরিয়ে গেল। অম্বর রায়ের উইকেট যখন পড়ল তখন ৫ উইকেটে ১২১ বাকি ৪০ বলে ৫ উইকেট ১০ রানে। এ হারার কিছু মানে হয় কি?

অম্বর রায় এই খেলায় দুই ইনিংসেই বিশেষ কিছুই সুবিধে করতে পারে নি। হয়তো টেস্ট ক্রিকেটের বাইরে যেতে হবে। একবার বাইরে গেলে আর ঢোকা খুবই মুশকিল।

ফুটবল

রাশিয়ান ফুটবল দলের সঙ্গে আই এফ এ একাদশের ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ানস্ মাঠে যে খেলায় ৩-০ গোলে হারলাম, তা দেখে মনে হল আন্তর্জাতিক খেলা খেলবার মতো আমাদের চেহারা নেই, দম নেই, কিছুই নেই। রাশিয়ার খেলোয়াড়দের কাছে আমরা সবাই বামন বিশেষ। দেখতে পেলাম আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে হলে আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য দুয়েরই প্রয়োজন।

এই তব শুভ আশীর্বাদ !

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে গান্ধিজী কথাপ্রসঙ্গে প্রিয় শিষ্য শ্রীসতীশ দাশগুপ্তকে বলেছিলেন, তাঁর বড় ইচ্ছে যে একটি সত্যিকারের ভালো স্বদেশী কালি তৈরী হয়। দেশের মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত দুই তরুণ "মৈত্র" ভ্রাতা তখন সবে জেল থেকে বেরিয়েছেন। সতীশ বাবু তাঁদের দুজনকে ডেকে এই মহৎ কাজের ভার দেন। সহায় সম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই, তবু শুধু নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম সম্বল করেই তাঁরা দুজন এই দুঃসাধ্য ব্রতের ভার মাথায় তুলে নেন। আজকের বিশ্ববিখ্যাত সুলেখা ফাউন্টেন পেন কালির এই হল গোড়ার কথা।

সুলেখার আজ যে এই সুনাম ও সমাদর, এটা গ'ড়ে উঠতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে, নিরলস গবেষণা, কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সমর্থনে এই বিপুল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

যাঁর প্রেরণা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু, সেই জাতির জনকের পুণ্য জন্মশতবর্ষে, তাঁর উদ্দেশ্যে বিনত নমস্কারে নিবেদন করি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক, কলিকাতা৩২

Progressive/SW-46

প্রতিযোগিতার ফলাফল

কথায় কথায় প্রতিযোগিতার অনেক ভাল ভাল উত্তর পাওয়া গেছে, কিন্তু বিশেষ ভাবে তিনটিকে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় স্থির করা যায় নি। তাই জন্য, একজনকে প্রথম পুরস্কার হিসাবে ১০৲ টাকা দিয়ে সাতজনকে তিনটাকা হিসাবে দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া স্থির হয়েছে।

এদের উত্তরগুলি ছাপান হল। তাছাড়াও কারো কারো একটা উত্তর খুব ভাল, তাও কয়েকটা ছাপান হল। তোমরা সবাই অভিনন্দন জেনো।

প্রথম পুরস্কার ঃ ২৭ কৃষ্ণকলি সেন।

দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ২৯৫ শম্পা দত্ত। ৩২১ বন্দিতা ঘোষ। ৮৯০ কারুবাকি ও বিপাশা দত্ত। ১২৩৩ স্বাতী সিংহ। ১২৩৪ অনিন্দিতা সরকার (সচিত্র উত্তর, ছবিও সুন্দর)। ১৯৩৮ লীনা মিত্র। ২৪০৩ সুস্মিতা দাশগুপ্ত।

অন্যান্য খুব ভাল উত্তর—৩২১ অজন্তা ঘোষ, ২০৪০ সন্দীপন দেব, ২৫১৯ জুলু সেন, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু, ২৯৪৫ অমল বসু, ২৯৬৭। **মৌসুমী ও শ্রাবণী মিত্র**। ২৭ কৃষ্ণকলি সেন **গান**—সুর-সুঁড়-গজ-**কচ্ছপ**। **বালিশ**—তুলা-রাশি-নক্ষত্র চন্দ্র **রকেট**। **রাজা**—নবাব-পতৌদি-ক্রিকেট-ফুটবল-শীল্ড-কাপ-চা **বিস্কুট**। **সমুদ্র**—পুরী-গয়া-কাশী-কাশি-জ্বর-থার্মোমিটার। **২৯৫ শম্পা দত্ত**—**গান**—পাখি, আকাশ, মেঘ, জল, সমুদ্র, **কচ্ছপ**। **রাজা**—রাজভোগ, মিষ্টি, স্যাকারিন, চা **বিস্কুট**। **বালিশ** তুলো, সুতো, চরকা, চরকাকাটা বুড়ি, চাঁদ, **রকেট**! **সমুদ্র**—ঢেউ, ফেনা, সাবান, স্নান, ঠাণ্ডা, জ্বর, থার্মোমিটার। **৩২১ বন্দিতা ঘোষ**—**গান**—তাল ভাদ্র-আষাঢ়-বর্ষা-জল-জলাশয়-**কচ্ছপ**। **রাজা**—রাজ্য-আসাম-চা-বাগান চা **বিস্কুট**। **বালিশ**—ঘুম-রাত্রি-জ্যোৎস্না চাঁদ **রকেট**। **সমুদ্র**—জল-ঠাণ্ডা-সর্দি-জ্বর-**থার্মোমিটার**। **৮৯০ কারুবাকি ও বিপাশা দত্ত**। **গান**—বাজনা-বীণা-সরস্বতী-হাঁস-ডিম-কচ্ছপেরডিম-**কচ্ছপ**। **রাজা**—প্রজা-প্রজাপতি-বিবাহ-অতিথি-চা-**বিস্কুট**। **বালিশ**—বিছানা-বেডিং-ভ্রমণ-মহাকাশ ভ্রমণ-রকেট। **সমুদ্র**—জল-বাষ্প-মেঘ-বৃষ্টি-ঠাণ্ডা-সর্দি-জ্বর-থার্মোমিটার। **১২৩৩ স্বাতী সিংহ**—**গান**—রেডিও তরঙ্গ-জল-পুকুর-**কচ্ছপ**। **রাজা**—সভা-কবি-কলম-কাগজ-মোড়ক মুড়কী-**বিস্কুট**। **বালিশ**—মাথা বুদ্ধি-আবিষ্কার-**রকেট**। **সমুদ্র** - বালু-মরুভূমি-তাপ-**থার্মোমিটার**।

১২৩৪ অনিন্দিতা সরকার। **গান**—বাজনা-সানাই-বিয়েবাড়ি-ভোজ সন্দেশ-সন্দেশ (পত্রিকা) সত্যজিৎ রায়—চিড়িয়াখানা-**কচ্ছপ**। **রাজা**—প্রজা-সাজা-পান-চা-**বিস্কুট**। **বালিশ**—পাটি-পাটীগণিত-গণিত-বিজ্ঞান চন্দ্রাভিযান **রকেট**। **সমুদ্র**—জাহাজ-সমুদ্রপীড়া-ডাক্তার-থার্মোমিটার। **১৯৩৮**—**লীনা মিত্র**। **গান**—বাজনা-খোল-**কচ্ছপ**। **রাজা**—দেশ-প্রদেশ-আসাম-চা-**বিস্কুট**। **বালিশ**—ঘুম-রাত্রি-চাঁদ **রকেট**। **সমুদ্র**—জল-বাষ্প তাপ-**থার্মোমিটার**। **২৪০৩**—**সুস্মিতা দাশগুপ্ত**। **গান**

—পাখি-আকাশ-মেঘ-জল-জলজন্তু-**কচ্ছপ**। **রাজা**—রাজ্য-আসাম-চা-**বিস্কুট**। **বালিশ**—বিছানা-রোগী-জ্বর-উত্তাপ-সূর্য-আকাশ-**রকেট**। **সমুদ্র**—লবণ-রান্না-আগুন-তাপ-**থার্মোমিটার**।

একটা করে ভাল উত্তর—

১। **সমুদ্র**—তিমি-চর্বি-মোমবাতি-তাপ **থার্মোমিটার** (পঙ্কজ চৌধুরী ১৯৬৯)

২। **রাজা**—প্রজা-প্রজাপতি-ফুল-মধু-চিনি-চা **বিস্কুট** (প্রসেনজিৎ বর্ধন ১৬৮৭)

৩। **রাজা**—সভা-ধুমধাম-ভোজ-অতিথি-চা-**বিস্কুট** (মধুজিৎ রায় ১৬১৭)

৪। **রাজা**—রাজভোগ-সন্দেশ-জলখাবার-চা-**বিস্কুট** (উত্তমকুমার বটব্যাল ১৪৪৭)

৫। **রাজা**—রত্ন-সিন্দুক-লোহা-ধাতু-টিন-**বিস্কুট** (নন্দিনী দত্ত মজুমদার ১২৩২)

৬। **বালিশ**—বিছানা-সুটকেস-ভ্রমণ-রেলগাড়ি-প্লেন-**রকেট** (সুগত ঘোষ ১২১৩)

৭। **গান**—কবিতা-কবি-সুকুমার রায়-আবোলতাবোল-বকচ্ছপ **কচ্ছপ** (অজন্তা ঘোষ ৩২১)

৮। **গান**—ভাটিয়ালি-মাঝি-নৌকা-নদী-**কচ্ছপ** (স্বপন শেখর রায় ৩০৭)

৯। **রাজা**—রাণী-এলিজাবেথ ব্রিটেন-ব্রিটানিয়া-**বিস্কুট** (রঞ্জন ও শুভাশীষ ব্যানার্জী ২৬২৯)

১০। **বালিশ**—তুলো-মেঘ-আকাশ চাঁদ **রকেট** (চিত্রাঙ্গদা ও চৈতালী বসু ২৬২৯ ও মায়া রায় ২৫৪)

১১। **গান**—রাগ-মার কান্না-জল-**কচ্ছপ** (ভাস্কর মিত্র ২৮০৭)

১২। **রাজা**—সিংহাসন-চেয়ার হাতল-হাত-হাতা-ভাত-রুটি-আটা-ময়দা-এরারুট-**বিস্কুট** (অমল বসু—২৯৪৯)

১৩। **গান**—বাজনা-বাঁশী-কৃষ্ণ-অবতার-**কচ্ছপ** (মনামী রায় ২১৯৪)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ছাপাখানায় কর্মবিরতির জন্য সন্দেশ প্রকাশিত হতে কয়েকদিন দেরী হল।

আমরা এর জন্য বিশেষ দুঃখিত।

নূতন ধাঁধা

(উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে জানুয়ারি)

১

'কলিকল অকলক কলষে কালা কয়ে কলিকলি গাকে !'

'হে বরে হরিহারে হরিহাতায় হোরাহুরি হম চরে ?'

কি সর্বনাশ ! সন্দেশের প্রুফ দেখতে গিয়ে দেখি যে দুটো লাইনের কোন মানেই বোঝা যাচ্ছে না—মনে হচ্ছে যেন সব কটা অক্ষরই এলোমেলো ভাবে বসানো হয়েছে !! এদিকে, কপিটাও হারিয়ে গেছে তাই মিলিয়ে দেখতে পারা যাচ্ছে না।

একটু লক্ষ্য করে দেখে কিন্তু বুঝলাম যে ভুলগুলো এলোমেলো ভাবে হয় নি, কেবল দুটো বিশেষ অক্ষরের সঙ্গে অন্য দুটো বিশেষ অক্ষরের বদলাবদলি হয়ে গেছে অন্যান্য সমস্ত অক্ষর আর আকার-ইকার সবই ঠিক আছে। তক্ষুনি আসল কথাটা বুঝে ফেললাম। তোমরা বল দেখি—

(ক) কোন কোন অক্ষরের সঙ্গে কোন কোন অক্ষরের বদলাবদলি হয়েছে ?

(খ) আসলে লাইন দুটো কি ছিল ?

২

বারোটি সমান কাঠি মাটিতে সাজিয়ে একই আকারের সমান আয়তনের ছটা ঘর বানাতে পার কি ?

মনে রেখো—(ক) কোন কাঠি ভাঙ্গতে বা বাঁকাতে পারবে না।

(খ) ঘরগুলি কাঠি দিয়ে ঘেরা থাকবে, কোন দিকে ফাঁক থাকলে চলবে না।

(গ) প্রত্যেকটা ঘরের প্রত্যেকটা দিক পরস্পরের সমান হবে।

(ঘ) প্রত্যেকটা ঘরের প্রত্যেকটা দিক মূল কাঠির সমান হবে। কেমন করে বানাবে এঁকে দেখাও।

৩

শ্রীজগন্নাথ জয়পুরিয়া সন্ধ্যা সম্মিলনীর সভ্য হয়ে প্রথম যেদিন আসরে এলেন, গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই উপস্থিত ছয়জন সভ্য তাঁকে সমাদরে ঘিরে ধরলেন।

একজন এগিয়ে এসে বললেন—আসুন, মশাই, আসুন। আমি কনকেন্দু কর, সংক্ষেপে ক-ক, ইনি খগেন্দ্র খইতান অথবা খখ, আপনার ডানদিকে গজানন গর্গ বা গ-গ, উনি ঘণ্টেশ্বর ঘটক, ঘ-ঘ, আপনার ঠিক পিছনে চন্দন চট্টরাজ চ-চ, বাঁদিকে ছত্রপতি ছত্রী বা ছ-ছ ! আসুন মশাই, জগন্নাথ জয়পুরিয়া বা জ-জ !'

সবাই হেসে উঠলেন।

হাসি থামলে জ জ উত্তর দিলেন—'আরো একটা মজা লক্ষ্য করেছেন? আপনাদের গাড়ির নম্বর গুলি হল ৬২৫৭, ০২৬৫, ০৭৩৫, ১৯১১, ২০০৪, ৫৮৩৯।

আপনাদের প্রত্যেকের গাড়ির নম্বরের সঙ্গে আমার গাড়ির নম্বরের একটি সংখ্যার এবং অবস্থানের মিল রয়েছে। অথচ আমার গাড়ির নম্বরের চারটে সংখ্যাই আলাদা, কোন দুটো এক নয়।'

বল ত জগন্নাথ জয়পুরিয়ার গাড়ির নম্বর কত?

অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর।

(১)

গল্পের মধ্যে বারোটা পাখির নাম লুকোন আছে—পিক, ময়না, বাজ, কাক, বক, পায়রা, চীল, চড়াই, হাঁস, চাতক, মাছরাঙ্গা আর পাপিয়া।

(২)

ছেলেটি বুদ্ধি দিয়েছিল—বাসের টায়ারের হাওয়া বার করে দিলেই, বাসটা একটু নিচু হয়ে যাবে। তখন অনায়াসে সেটাকে ঠেলে পার করা যাবে। তারপরে আবার হাওয়া ভরে নিলেই চলবে।

(৩)

বসু মহাশয়=অধ্যাপক, তাঁর স্ত্রী=গাইয়ে, বোন চিত্রকর, ছেলে চিকিৎসক আর শ্বশুর সাহিত্যিক।

কার্ত্তিক মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম।

যাদের সব কয়টি উত্তর ঠিক ঃ—

৮৯০ কারুবাকী ও বিপাশা দত্ত, ১৬৫৫ শৃন্বন্তী পাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২৫৪১ দেবোপম চক্রবর্তী, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত।

যাদের দুইটি উত্তর ঠিক ঃ—

১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৮২ নুপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ২৮৮ গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৯৫ শম্পা, শর্মিলা ও শ্রেয়া দত্ত, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৮৮৯ প্রেমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১২৩৪ অনিন্দিতা সরকার, ১৩৪৮ রীতা, রুমা, বাসব, শান্তনু ও গৌতম রায়, ১৪২৫ মিত্রা রায় চৌধুরী, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৮২৭ অমুতোষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ২০৪০ সন্দীপন দেব, ২১৫৯ স্বাহা ও শুভংকর বাগচী, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায়-চৌধুরী, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু, ২৫৬২ সিদ্ধার্থ রায়।

যাদের একটি উত্তর ঠিক ঃ—

১৭৫ অনিতা রায়, ১০৮৬ তুহিন, অভিজিৎ ও সোমনাথ দাশগুপ্ত, ১৪০১ মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৬২ প্রদীপ পারেখ, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২২৪ শুভময়, কল্যাণময় ও নন্দিনী চট্টোপাধ্যায় ২২৪৮ দেবকুমার, মিহির-কুমার ও শৈবালকুমার গুহ, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২৬৫৩ অসিতনাথ ভট্টাচার্য, ২৮৩৭ অর্পিতা রায় চৌধুরী, অনন্যা (পদবী কি? গ্রাহক সংখ্যা কত?)

আপনার জন্য
বাড়ির সকলের জন্য

ব্রিটানিয়া থিন এরারুট

খেতে ভালো,
পুষ্টিকর—
সবাইকার
মনের মতো

ব্রিটানিয়া মানেই সেরা বিস্কুট

BBC 9234

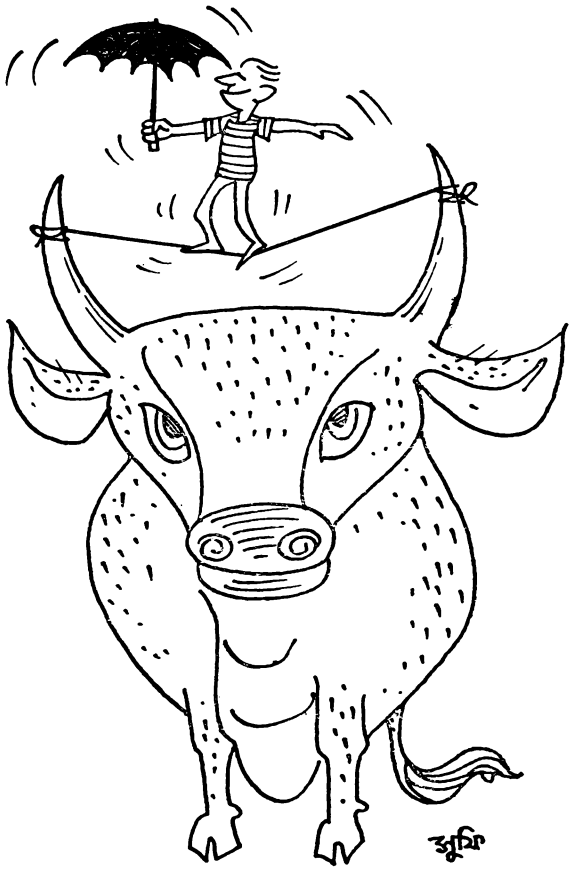

দেখো খেল—

খেল্ দেখো—

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সৌরভ দে

স্ক্যান ও এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com